নগর দর্পণে

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৩

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

নগর দর্পণে

॥ এক ॥

টি রসিক মানুষ। হেসে বললেন, আপনি বোধহয় প্রাচীন
ান পর্যটক ছিলেন—ফা হিয়েন বা হিউয়েন সাঙ, কি বলেন?
ল অল্প অল্প হাসছে। সেই হাসির ছোঁয়া অনুপম চক্রবর্তীরও
ফাঁক দিয়ে চোখের দিকে উঠতে লাগল। ঘরের সব ক'টি
ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। নিজের স্ত্রী শ্রীলেখার
াই সব থেকে মিষ্টি লাগল। ও আজকাল কথায় কথায়
বয়সের কথা শোনায় অনুপমবাবুকে, বলে বত্রিশটা বছর
র দিলাম, আর কি…।

পম চক্রবর্তীর
ঙ্গে নরম-সরম
করে উঠল তাঁর
ওস্তাদ, কিন্তু উ·টা

কেন শোনায় অনুপম চক্রবর্তী তাও অনায়াসে
পারেন। মুখের দিকে চেয়ে ভিতবট' আয়নায় দেখাব
শক্তিটা দিনকে দিন বাড়ছে তাঁর। আব শ্রীলেখার দিক
তো রক্ত-মাংস ছাড়িয়ে তাঁব চোখ দুটো ভিতরের বংক
পৌঁছুতে পাবে।···শ্রীলেখা ঘনঘন আজকাল নিজেব বয়
তোলে কারণ তার ধাবণা, তাব চাকবীব পবিবেশটাকে শ্যর্ম
বা বক্রচোখে দেখা শুরু কবেছেন। সেদিন যে চাকবি
একটা প্রমোশন হয়ে গেল তাব, তাই নিয়েও অনুপমবাবু
চটুল রসিকতা কবেছিলেন। তিনি জানেন এ-দিকটা
শ্রীলেখা এত বেশি কবে নিজেব বযসের প্রসঙ্গ তোলে এখন
বুঝিয়ে দিতে চায় যৌবনের খেলাব বেলা গড়িয়েছে—স
বাস্তব এখন। · ডাগর চোখের একটা হরিণ শিশু দেখছেন
বাবু তাঁর দিকে চেযে। মানুষেব সঙ্গে পশুব যোগ আছে
তাঁর বদ্ধ ধারণা। শুধু তাঁব কেন, দুনিয়াব বড বড় বিজ্ঞানী
অবিসম্বাদি সত্য বলে ঘোষণা করে গেছেন। এ নিয়ে
বাবুরও নিজস্ব একটা বিশ্বাস পরিপুষ্ট হয়ে চলেছে। ভিন্ন
পুরুষের ওপর ভিন্ন ভিন্ন পশু প্রকৃতিব প্রভাব। এই বিশ্বাসের
কারো দিকে তাকিয়ে একটু চেষ্টা কবলেহ তাব মধ্যে ভি
জলজ্যান্ত পশুটাকেই দেখতে পান তিনি। দেখে নিজেই
বেশিব ভাগ সময় ধাক্কা খান, তাই মানুষ সামনে এলে মানুষই
চেষ্টা করেন—তাব ভিতরেব পশুপ্রকৃতিটার দিকে চোখ
থাকেন। কিন্তু শ্রীলেখার মধ্যে ডাগর চোখের ভীরু নবম
হরিণ শিশুটাকে দেখতে তাঁর ভাল লাগে। এখনও লাগে
[illegible]। দু' ঠোঁটের ডগায় একটু হাসি ধরে রেখেছে, কি
[illegible] স্পষ্ট। পাখার হাওয়ায় শুকনো চুলের দুই

বার বার ওর মুখের ওপর এসে আছড়ে পড়ছে আবার নিজে থেকেই সরে যাচ্ছে।

অনুপমবাবুর হাসিমাখা দু'চোখ স্ত্রীর মুখ থেকে সরে মেজ ভাই অজিতেশের দিকে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিচিত পশু-চিত্র সামনে ভেসে ওঠার তোড়জোড় করতেই সবলে ঠেলে সরালেন সেটা। না, দেখতে চান না, দেখতে চান না তিনি—মেজ ভাই অজু আর ছোট ভাই অমিয় দুজনে বুকের দু'খানা পাঁজর তাঁর—ওদের তিনি নিজের এই উদ্ভট বিশ্লেষণের আওতায় টেনে আনতে চান না। শুধু ওদের দুজনের বেলাতেই নিজের ওই বিশ্বাস আর বিশ্লেষণটাকে উদ্ভট ভাবতে চেষ্টা করেন তিনি। ডাক্তারের কথায় অজুর পুরু ঠোঁটের হাসি আর একটু স্পষ্ট। ওই হাসি দেখলে কৌতুকে দু'চোখ চিকিয়ে ওঠে অনুপমবাবুর। দুনিয়ার কিছুই যেন ওর জানতে বুঝতে বাকি নেই। ওর চাকরির দৌলতে এই হাসিটা এমন রপ্ত হয়ে গেছে যে চেষ্টা করলেও ও আর অন্যরকম করে হাসতে পারে না বোধ হয়। পুলিস দপ্তরের ও একজন হোমরা চোমরা ব্যক্তি এখন, দেশের দুর্যোগ যত বাড়ছে ও তত টপাটপ প্রমোশন পাচ্ছে। অর্থাৎ দুর্যোগে ওর যোগ্যতার পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। সকলের উঁচুতে সব থেকে বড় আসনটাও ভবিষ্যতে ওর দখলে আসবেই এক দিন, সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল। সেটা খুব দূরের ভবিষ্যত ভাবে না ও, আর বড়জোর দশ বারো বছর। ওর ঠোঁটের হাসিতে সব জানা আর সব বোঝার প্র[illegible]থা যাবে না তো কার যাবে?

বয়সে[illegible]লেখার মুখ থেকে অজিতেশের মুখ হয়ে অনুপম চক্রবর্তীর [illegible]র দি[illegible]ক ভরা চোখ দুটো শুক্লার দিকে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে নরম-সরম [illegible] বাবুই পাখির ছোট দুটো ডানা যেন উসখুস করে উঠল তাঁর [illegible]র সামনে। বাবুই পাখি বাসা বুনতে ওস্তাদ, কিন্তু উল্টো

বাসা। উল্টো কলসীর মত সেই বাসার নীচের দিকটা খোলা, আর সেই খোলা মুখ হাঁ হয়ে নীচের দিকে ঝুলছে। পাখির রীতি জানেন না অনুপমবাবু, কিন্তু রক্ত মাংসের একটা মেয়ে বাবুই পাখির মত হলে তার উল্টো বাসার খোলা মুখ কি যেন এক দুর্বোধ্য অস্বস্তির কারণ। মাথা থেকে সেই দুর্বোধ্য চিন্তার বাষ্প ঠেলে সরান তিনি—বাসার কথা না ভেবে ওকে শুধু সকলের প্রিয় বাবুই পাখিই ভাবতে ভাল লাগে তাঁর। অজিতেশের বউ শুক্লা। ওর ঠোঁটেও হাসির বুনোট খেলা করছে একটু। সকলে হাসছে, ও চটপটে সপ্রতিভ মেয়ে একটা, ও হাসবে না! অজিতেশের চাকবিতে যত উন্নতি হচ্ছে, শুক্লার হাসিতে তত সুন্দর সুন্দব কারুকার্য আবিষ্কার করছেন অনুপমবাবু।

তিন তিনটে মুখ ঘুরে অনুপমবাবুর কৌতুক ভবা হাসিমাখা দু'চোখ আবার ডাক্তারের দিকে ফিরে এল। হঠাৎ মনে হয় ডাক্তারের কাঁধের ওপর মস্ত একটা খরগোশের মুখ বসানো—ঠিক যেন খরগোশ হাসছে একটা

খরগোশের হাসি। সে আবার কেমন? কোন খরগোশকে হাসতে দেখেছেন নাকি কোনদিন। নাঃ, ওদের আর দোষ কি, মাথাটা আর চিন্তা-টিন্তাগুলো সত্যিই কেমন গোলমেলে রাস্তায় চলেছে আজকাল।

ডাক্তারের বোকা-বোকা প্রশ্ন আর হাসির জবাবে জোরেই হেসে উঠতে যাচ্ছিলেন অনুপম চক্রবর্তী, সামলে নিলেন। হেসে উঠলে ডাক্তার কি ভাববে জানেন। শ্রীলেখা অজু শুক্লা কি ভাববে জানেন। ওদের চাপা আশংকার, আশংকার কেন, চাপা বিশ্বাসের একটা জোরালো সমর্থন মিলবে তাহলে। হাসির জবাব না দিয়ে তাই হাসিমুখে কথার জবাব দিলেন অনুপমবাবু। বললেন,

পর্যটকের খোঁজে একেবারে বিদেশে পাড়ি জমাতে হল ডাক্তার সাহেব—দেশের কাউকে খুঁজে পেলেন না ?

এতক্ষণ বাদে এই জবাব পেয়ে ডাক্তার ভদ্রলোক সত্যি সত্যি অপ্রতিভ যেন একটু।—দেশেব সেবকম নামজাদা পর্যটক ছিল নাকি কেউ ?

অনুপমবাবু সাদাসাপটা জবাব দিলেন, আমার মতে ওই যাদের নাম কবলেন তাদেব থেকে অন্তত কম নামজাদা ছিল না অতীশ দীপংকর—কিন্তু আপনার আব দোষ কি ? গাঁয়েব যোগীর কবে আব ভিখ মেলে ?

আবাবও মজা লাগছে ওই শ্রীলেখার দিকে চেয়ে। তুনিয়ার সকলকে খুশি রাখার দায় যেন শুধু ওবই। পাতলা ওই লালচে ঠোঁটের হাসিটুকু নিতান্তই অভ্যাসেব দাস, সঙ্কোচভরা চাউনিটা ডাক্তারের মুখের ওপব আটকে আছে। স্বামীর কথায় ভদ্রলোক ভিতবে ভিতরে জখম হলেন কিনা দেখছে। আশা নিরাশার জাত্নকাঠি যেন ওই ডাক্তারেরই হাতের মুঠোয় এখন।

স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তে কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন অনুপমবাবু।···তাঁর ওপর শ্রীলেখার নির্ভরতা যত কমছে, অপবেব অখুশি হওয়াব আশঙ্কা যেন তত বাড়ছে।···তাহলে আপিসে কি করে ? ওর আপিসের কর্তাদের মধ্যে কয়েকটা হাঙর-কুমীর আছে। অনুপমবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন। স্ত্রীকে সেই পশু প্রকৃতি দর্শনের কথা বলেছেনও ঠাট্টা কবে। শ্রীলেখা অবশ্য বিশ্বাসও করে না, স্বীকারও করে না, বলে, তোমার চোখের দোষ। তা বলে অনুপমবাবুর ধাবণাটা বদলায়নি। এই তুনিয়ায় সকলেই খুশির খোঁজ করে, বাঘ হরিণ দেখলে খুশি হয়, শকুনি মড়া দেখলে—আপিসের অনেক হাঙর কুমীর মেয়ে দেখলে খুশি হয়—এ অভিজ্ঞতা·

তাঁর নিজেরই আছে। দেখার খুশিতে একটুও আপত্তি নেই অনুপম বাবুর।

...সুশ্রী মেয়ে দেখলে কে না খুশি হয়? ওই যে দাঁড়িয়ে আছে শুক্লা, অজিতেশের বন্ধুবান্ধবের সামনে যার এক ধরণের রূপ খোলে—ঘরে আটপৌরে বেশে আর এক রকম—সম্পর্কে তো অনুপমবাবু কত বড় ভাসুর—ওকে দেখলেও কি তাঁর দু'চোখ প্রসন্ন হয় না? খুশি হোক তাতে অনুপমবাবুর আপত্তি নেই, কিন্তু যে খুশির উপসংহার শুধু সংহার—সেখানেই যত গোলযোগ।... শ্রীলেখাও চায় আপিসের ওপরঅলারা ওর ওপর খুশি থাকুক, খুশি থাকলে সুবিধে হয়, প্রমোশন মেলে, সেটা একটা স্থায়ী বাস্তব ব্যাপার। দরকার পড়লে নিরামিষ খুশির রাস্তায় একটু আধটু পা বাড়াতে কোন চাকুরে মেয়ের আপত্তি হবার কথা নয় (নিরামিষ খুশির সংজ্ঞাটা অনুপমবাবু পরে ভাববেন), কিন্তু ডাক্তারের দিকে শ্রীলেখা যেমন চেয়ে আছে—খুশি হল কি অখুশি হল ভেবে না পেয়ে, ওই রকম হাসি মেশানো ভয়ে ভয়ে ওর আপিসের কর্তাদের দিকেও চেয়ে থাকে হয়তো—এরকম মনে হওয়া মাত্র ভিতরে ভিতরে একটা যন্ত্রণা তাকে পেয়ে বসে।

সচকিত হলেন। যেটুকু সময় তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন, ডাক্তার সেই ফাঁকটুকুর মধ্যেই বেশ করে দেখে নিচ্ছেন তাঁকে। শুধু ডাক্তার কেন, অজিতেশ আর শুক্লাও।

কি হল?

সেই মুহূর্তে ভোলবদল ডাক্তারের।—না অতীশ দীপংকরের সম্পর্কে আরো কিছু বলবেন ভাবলাম। সত্যি, এদিক থেকে মুখ্যুই আমরা। যাক্, কাল অত হাঁটার সুফল কি হল বলুন, রাতে ভাল ঘুমিয়েছেন?

না। সমস্ত রাতই জেগে কেটেছে।

সেকি! এখান থেকে দক্ষিণেশ্বর কত মাইল?···কম করে পনের মাইল, কলকাতার প্রায় এমাথা আর ওমাথাই তো··· যাতায়াতে হল গিয়ে তিরিশ মাইল···এত হাটার পরেও রাত্রিতে ঘুম হল না?

অনুপমবাবু হাসতে লাগলেন। জবাব দিলেন, অজুর সেই-রকম টেলিফোন পেয়েই তো আপনি চলে এসেছেন— ঠিক না?

মজাই লাগছে। জবাবের প্রত্যাশা করছেন না অনুপমবাবু। ডাক্তার আর অন্য সকলের মুখ দেখেই বুঝতে পারছেন ওদের গোপন চেষ্টা ফাঁস। এ লাইনের ডাক্তারদের একটা গুণ যে কোন পরিস্থিতিতে হাসতে পারেন। এ লাইনের বলতে মাথার লাইনের। কলকাতার নামকরা পাগলের ডাক্তার দেখানো হচ্ছে অনুপম চক্রবর্তীকে এই নির্ভেজাল সত্য কথাটা বাড়ির কেউ বলে না। ঘুরিয়ে বলে ইনি স্নায়ু ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা ভাল দেন, আর এক-গাদা ঘুমের ওষুধ না গিলিয়ে চামড়ার ঠিক নীচে ছোট্ট ইনজেকশন দিয়ে আর এক্সপার্ট লোক দিয়ে মাসাজ করিয়ে ভাল ঘুমের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

দেওর বউদিতে শলা-পরামর্শ করে যত মোলায়েম ফিরিস্তিই দিক, অনুপম চক্রবর্তী তক্ষুনি বুঝে নিয়েছিলেন ডাক্তারটিকে। হাসিই পেয়েছিল তাঁর, কিন্তু একটু ঘুমের ব্যবস্থা যদি সত্যিই হয় সেই ভেবে আপত্তি করেননি। স্নায়ু নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই—সেটা এত ঠাণ্ডা এত সক্রিয় আর এমন সচেতন বলেই ওদের চিন্তা। আজ দেড় মাস হল এই ডাক্তার চিকিৎসা করছেন—তাঁর চিকিৎসায় ঘুমের আরো বারোটা বেজে গেছে—ঘুমিয়ে উঠলেও মনে হয় ঘুম হল না। কিন্তু ভাই আর স্ত্রীর দিনকে দিন আস্থা বাড়ছেই

ভদ্রলোকের ওপর—এদের পীড়াপীড়িতেই নিজের চিকিৎসার ব্যাপারে অনুপমবাবু হাল ছেড়েছেন।

হাসিমুখেই বাঁকা পথ ছাড়লেন ডাক্তার।—যাক, সমস্ত রাত ধরে তাহলে কি করলেন বলুন, লিখলেন ?

বুকের তলায় মোচর পড়ল একটা। কাল, মাত্র গতকাল অনুপমবাবু নিজেকে বিচারকের আসনে বসিয়ে লেখক অনুপম চক্রবর্তীর অস্তিত্ব বাতিল করেছেন। তার জন্যে যুঝতে হয়েছে, কঠিন হতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতিল করতে পেরেছেন। পেরেছেন বলেই গতকাল কলেজ স্ট্রীটের সেই ঝানু প্রকাশকের হাসি হাসি মুখখানা তার রোষের আগুনে ঝলসে যায়নি।

বুকের তলায় ওই অবাঞ্ছিত মোচড়টাকে হাসির আঘাতেই যেন নির্মূল করতে চাইলেন তিনি।—না মশাই না, খেয়ে-দেয়ে শ্রীলেখা না ঘুমনো পর্যন্ত মড়ার মত বিছানায় পড়ে রইলাম।···বেচারী সমস্ত দিন আপিস করেছে, বাড়ি ফিরে আমাকে না দেখতে পেয়ে রাত দশটা পর্যন্ত ছটফট করেছে, অজুকে দিয়ে কত জায়গায় খবর নিয়েছে ঠিক নেই—এর পরেও ঘরে আলো জেলে লেখার জ্বালায় রাতে একটু যদি ঘুমুতে না পায় অজুই আমার নামে মার্ডার চার্জ আনবে।

এবারে অনুপমবাবু একাই হাসছেন। শ্রীলেখা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। ডাক্তার মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর ?

অনুপমবাবু গড়গড় করে বলে গেলেন, আধঘণ্টার মধ্যেই শ্রীলেখা ঘুমে অচেতন। বিছানাটা কাঁটার মত গায়ে ফুটছিল আমার। পা টিপে টিপে খাট থেকে নামলাম—বাথরুমে এসে মাথার ওপর শাওয়ার খুলে দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে চান করলাম। গা-মাথা ঠাণ্ডা হল, ভাবলাম এবারে হয়তো একটু ঘুমুতে পারব।

পারলাম না, সেই আগের দশা। তারপর আর কি, উঠে পায়চারি করতে লাগলাম—

সমস্ত রাত ?

হ্যাঁ। তবে রাত তিনটে নাগাদ শ্রীলেখার ঘুম ভাঙতে যত গণ্ডগোল। আমাকে হাত ধরে বিছানায় টেনে শোয়াবেই। তাইতেই আমাব বাগ হয়ে গেল। বলতে বলতে অনুপমবাবু হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন একবাব, তাবপর আবাব ডাক্তারের দিকে।—এখন আমার বাগটাকেও ওবা ভিন্ন চোখে দেখে ডাক্তার, ফিরে রাগ করে না, তার বদলে আপনাকে খবব দেয়। হা হা শব্দে হেসে উঠলেন তিনি।

হাসি থামতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, সমস্ত রাত তাহলে পায়চাবি কবে কাটালেন। তারপর ?

ভোরের আলো জাগতেই বেড়াতে বেবিয়ে পড়লাম। অনেকটা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখি আব একটা লোক আসছে, দেখেই বুঝলাম অজুর প্লেন ড্রেসের লোক, আমার ওপর চোখ রাখা তার ডিউটি। তক্ষুনি ওকে ফাঁকি দেবার মতলব মাথায় চাপল, কিন্তু লোকটার জন্য আবার দুঃখ হল—আমার ওপর চোখ না রাখতে পেরে ফিরে গিয়ে ধমক-ধামক খাবে, অজু তো আবার মস্ত কড়া অফিসার সকলের। আর, শ্রীলেখার কথাও বার বার মনে পড়তে লাগল, কাল দক্ষিণেশ্বর থেকে অত রাতে ফিরে ওর মুখখানা কি শুকনোই না দেখেছিলাম—

অনুপমবাবু উৎসুক হঠাৎ, হাসিমাখা চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বললেন, এর মধ্যে এমন একটা দৃশ্য দেখলাম ডাক্তার যাতে আমার সব ভাবনা-চিন্তা তলিয়ে গেল, আমি হাঁ করে তাই দেখতে লাগলাম—

শুধু ডাক্তারের নয়, সকলের জোড়া-জোড়া চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকাল।

শ্রীলেখার চোখে শঙ্কার ছায়া, এই বুঝি বেফাঁস কিছু শুনতে হবে। মেজভাই অজিতেশ চক্রবর্তী নির্লিপ্ত গম্ভীর, মনে মনে চাইছে দাদা মুখ খুললেই ভাল, ডাক্তার তার থেকে আরও সুস্পষ্ট হদিস পাবেন। শুক্লার স্বভাবচঞ্চল চাউনি উদ্‌বেগশূন্য নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতুকও মিশে আছে। দাদার ঘরে সে একলা বড় একটা আসে না, তার ভয় ভয় করে। কিন্তু এই পর্যায়ের রোগীর প্রতি তার সহজাত একটু কৌতূহলও আছে।

অনুপম চক্রবর্তীর দৃষ্টিটা সকলের মুখের ওপর পাক খেয়ে ফিরে আবার ডাক্তারের মুখের ওপর স্থির হল। কে কি ভাবছে না ভাবছে এক্ষুণি বলে দিতে পারেন। কিন্তু সকলের প্রতিক্রিয়া অনুভব করেও তাঁর মুখে হাসি ঝরল না। দু'চোখ চকচক করছে তেমনি। সকালের দেখা সেই দৃশ্যটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে যেন।

চিন্তায় খেই হারিয়েছে ভেবে ডাক্তার সেটা জুড়তে চেষ্টা করলেন।—কি দেখে আপনি অত অবাক হলেন, সকালের সূর্যোদয়?

ডাক্তারের কথা শুনে ঘরের মধ্যে একমাত্র শুক্লারই ঠোঁটের ফাঁকে আর চোখের তারায় হাসি ভাঙার দাখিল। সকলের গম্ভীর মুখ দেখে সেও সামলে নিল। কিন্তু পরমুহূর্তে সচকিত। একটা ভর্ৎসনার কশাঘাতে যেন শপাং করে ওর মুখের ওপর এসে পড়ল। —হাসি পেলে হাসবে, বাইরে রং চড়ানোর মত ভিতরেও মেকী রং চড়িয়ে বসে থেকো না!

শুক্লা থতমত খেয়ে উঠল এক দফা। ঘরের তিন জোড়া চোখ

তার দিকে ফিরল। শ্রীলেখার চাউনিতে মুহূর্তের বিভ্রম, তারপর সশঙ্ক আবেদন, নিঃশব্দে বলতে চাইল, কিছু মনে করিস না ভাই, বুঝতেই তো পারছিস—

আহত রক্তিম মুখে শুক্লা অজিতেশের দিকে তাকাল। অজিতেশ তেমনি নির্লিপ্ত গম্ভীর।

ডাক্তারের চোখে চোখ রেখেই অনুপমবাবু বললেন, দেখলাম ফুটপাথে একটা লোক খালি গায়ে ইটের ওপর মাথা রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

এই জবাবের জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না, অনুপমবাবু নিজেও বুঝতে পারছেন তা। তাঁর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি, কিন্তু চোখে যেন সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখার তৃপ্তি। বলে গেলেন, এমন সুখের ঘুম যে লোকটার কাপড়-চোপড় পর্যন্ত ঠিক ছিল না। আমি খাটের ওপর এক হাত গদি, তার ওপর ধপধপে নরম বিছানা, মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে, অথচ একটু ঘুমের জন্য কত সাধ্যসাধনা। আর ওই লোকটা শক্ত ইটে মাথা রেখে কেমন অকাতরে ঘুমুচ্ছে। আপনি বিশ্বাস করবেন না ডাক্তার, আনন্দে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। …অজুর সেই প্লেন ড্রেসের লোক কাছে এসে দাঁড়াতে ভয় ধরে গেল, পাছে ওই লোকটার ঘুম ভেঙে যায়, তাড়াতাড়ি পা বাড়ালাম।

স্বল্পক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করে ডাক্তার সহজ আশ্বাসের সুরে বললেন, আপনিও ওই রকমই ঘুমুতে পারবেন, দিনকতক সবুর করুন আর আমাদের কথা মত চলুন একটু। কাল আট ন'ঘণ্টার জন্য ও-ভাবে ডুব মেরে সকলকে কেমন ভাবিয়ে ছিলেন নিজেই তো জানেন—

শেষের আবেদন বা উপদেশ কানে গেল না, রাস্তার ওই লোকটার মত ঘুমুতে পারবেন শুনেই ঠোঁটের ফাঁকে গালের ভাঁজে আর চোখের

তারায় হাসি ভরাট হতে থাকল। জবাবটা মনে মনে দিলেন, ওই রকম ঘুম! অমন ঘুম তুমি নিজে কখনো ঘুমিয়েছ না আর কেউ ঘুমিয়েছে! তোমার রোগীর চিন্তা মানে নাম যশ টাকার চিন্তা, অজুর মাথার চাকরির চুড়োয় ওঠার চিন্তা, শ্রীলেখার আপিস করেও শ্যাম-কুল দুই-ই বজায় রাখার চিন্তা, ওই শুক্লার—

কৌতুক ঠাসা চাউনি শুক্লার দিকে ঘুরল। কিন্তু দৃষ্টি একেবারেই ওর মুখের ওপর স্থির হয়ে বসতে পারল না। ওঠা-নামা করল একপ্রস্থ। সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি আর বিরক্তি, কি ভাবছিলেন ভুলে গেলেন।···ওর শ্রীটুকুই সম্পদ, কিন্তু সেটা এমন প্রকাশোন্মুখ অস্থির কেন? তিনি ভাসুর, তাঁর কথা আলাদা, কিন্তু সকলেই তো ভাসুর নয়—কেন ওর দিকে তাকাতে গেলেই পুরুষের চোখে চুরির লোভ উকিঝুঁকি দেবে? দেয় যে, অনুপমবাবুর তাতে একটুও সন্দেহ নেই। আদিম মানবীর মত সহজ বন্য নগ্ন হবার সাধ্য নেই, গোপন সাধ আছে। আধুনিক বেশবাসের কারসাজির ফাঁক ধরে সেই সাধ মেটায়। তোমাদের চোখেই বা শান্তির ঘুম আসবে কোথা থেকে—

চাউনির আঘাতে শুক্লা চক্রবর্তী সকলের অলক্ষ্যে ধড়ফড় করে উঠল একপ্রস্থ। সকলের অলক্ষ্যে কারণ ডাক্তার উঠে পড়েছেন, অজিতেশ তার সঙ্গে দরজামুখো হয়েছে, আর শুকনো মুখে বড় জা-ও ওদের পিছু নিয়েছে। চকিতে সকলের অগোচরেই শুক্লা শাড়ির আঁচলটা টেপ-ব্লাউসের ওপর দিয়ে গলায় বুকে জড়িয়ে নিল। তারপর ওদের সঙ্গ নেবার উপক্রম করল।

কিন্তু তার আগেই একটা নীরব বাধায় পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল। একটা আঙুল তুলে ভাসুর ওকে দাঁড়াতে ইশারা করলেন। ডাক্তারের পিছনে অজিতেশ আর বড় জা বাইরে পা ফেলেছে।

শুক্লার বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠল কেমন। .অস্বস্তি চেপে জিজ্ঞাসু নেত্রে ভাসুরের দিকে তাকাল।

অনুপমবাবুর দৃষ্টি প্রসন্ন এখন। ঠোঁটের ফাঁকে অল্প অল্প হাসি। শাড়ির আঁচলটা গলায় আব বুকে জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন ওর সুন্দর মুখেব শ্রী বদলে গেছে। এখন আর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে না, বরং ভাল লাগছে, মিষ্টি লাগছে।

কিছু বলবেন ? শুক্লার সহজ হবার চেষ্টা।

এদিকে এস।

শুক্লা ভয়ে ভয়ে ছুই এক পা এগোল।

এই চেয়ারটায় বোসো।

ডাক্তার যে চেয়ারে বসেছিলেন সেটা দেখিয়ে দিলেন। বিছানা থেকে মাত্র হাতখানেক তফাতে ওই চেয়াব। অনুপমবাবু হাসছেন মিটিমিট। ওর ছুরবস্থা যেন অনুভব করতে পারছেন।

অগত্যা চেয়ারটা টেনে শুক্লা বসল। এই একজনের কথা ও আগেও কখনো অমান্য করতে পাবেনি, এখনো পারে না। চেয়ারটা টেনে বসার ফাঁকে একবার দরজার দিকটা দেখে নিল। দিদি এক্ষুণি এসে গেলে বাঁচে।

তখন ওই কথা বললাম বলে রাগ করেছ ?

রাগ হয়েই ছিল। এখনো সেটা একেবারে পড়েনি। ডাক্তার বাইরের লোক, তাব স্বামীকে তোয়াজ করে বলেই অত বড় চিকিৎসক হয়েও ডাকা মাত্র বিনা ফি-তে এসে রোগী দেখে যায়। তাঁর সামনেই ওকে অপমান করা হয়েছে, বলা হয়েছে, হাসি পেলে হাসবে, বাইরে রং চড়ানোর মত ভিতরেও মেকী রং চড়িয়ে বসে থেকো না। কিন্তু এই বিপাকে পড়ে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে মাথা নাড়ল শুক্লা। রাগ করেনি।

হৃষ্ট মুখে অনুপমবাবু বললেন, রাগ করবে কেন, তুমি তো ভাল মেয়ে···মুশকিল কি জানো, তুমি কত ভাল তুমি নিজেই জানো না, এই জন্যেই মাঝে মাঝে গোলমেলে ব্যাপার হয়ে যায়।

অসুস্থ মস্তিষ্কের দুর্বোধ্য উক্তি। বুঝতে চেষ্টা না করেই শুক্লা মাথা নাড়ল একটু, অর্থাৎ তাই।

অনুপম চক্রবর্তী হেসে উঠলেন, আচ্ছা ভীতু মেয়ে তো তুমি! পরক্ষণে ঈষৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।—তুমি আমাকে ভয় কর?

শুক্লা তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, ভয় করে না।

ভক্তি কর?

আবার মাথা নাড়ল, করে। অনুপমবাবু এবারে সশব্দেই হাসলেন। হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তুমি বাবুই পাখি দেখেছ?

দেখেছে কিনা শুক্লা জানে না। চিড়িয়াখানায় কত পাখিই তো দেখেছে, কোন্‌টা কি পাখি কে জানে। দেখেছে বললে জেরায় পড়ার সম্ভাবনা, দেখেনি বলাই নিরাপদ। মাথা নাড়ল, দেখেনি।

অজিতেশ আর বড় জা ঘরে ঢুকতে হাঁপ ফেলে বাঁচল যেন। প্রথম সুযোগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ওকে ওই চেয়ারে বসে থাকতে দেখে দুজনেই অবাক একটু। বেশি অবাক অজিতেশ। সে জানে অন্য লোক না থাকলে স্ত্রীটি দাদার ঘরে ঢুকতেই চায় না। শুক্লা এর মধ্যে বারকয়েক তাকে বলেছে, আচ্ছা, দাদা প্রায়ই আজকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখেন বল তো? অজিতেশ সাদাসাপটা জবাব দিয়েছে, সুন্দর মুখ দেখে, আর কি দেখবে।

ভাসুরকে আগে সব থেকে বেশি পছন্দ করত শুক্লা। এখনো ভক্তি না করুক, সমীহ করে। মুখ লাল করে ঠেস দিয়েছে, পুলিসে চাকরি করে তোমার মুখ খারাপ হয়ে গেছে।

পরে নিজের উক্তির স্বপক্ষে শুক্লাকে মহাভারতের একটা গল্প বলেছিল অজিতেশ। বকরূপী-ধর্ম ভীম অর্জুন নকুল সহদেবকে একে একে প্রশ্ন করেছিল, অটুটযৌবনা মা কুন্তীকে দেখে তাদের মনে কামভাব জাগা সম্ভব কি না। শুনে ওরা চার ভাই বকরূপী ধর্মকে এই মারে তো সেই মারে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন করতে সে জবাব দিয়েছিল, খুব সম্ভব, কিন্তু জ্ঞানশলাকা দিয়ে আমরা সেই সম্ভাবনাকে বিদ্ধ করে থাকি।···দাদার বেলায়ও তাই, যতদিন জ্ঞানশলাকা ঠিক ছিল ততদিন সে ভাসুর, সেটা যখন যেতে বসেছে তুমি তার চোখে সুন্দরী মেয়ে ছাড়া আর কি!

শুনে শুক্লার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, একটুও বিশ্বাস করতে চায়নি, অথচ অবিশ্বাস করার মত জোরের অভাব।

শুক্লার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই অজিতেশ বুঝে নিয়েছে দাদা আটকেছিল ওকে। কিন্তু এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। এ চাকরির আওতায় এসে সে অনেক কাণ্ড দেখেছে। বোনপোকে মাসির ওপর হামলা করার দায়ে ধরেছে, শালীর মেয়ে নিয়ে উধাও মাঝবয়সী মেসোকে গ্রেপ্তার করেছে, গত দশটা বছরের মধ্যে এ-রকম কত অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ঠিক নেই। যুধিষ্ঠির প্রোক্ত সেই জ্ঞানশলাকার ওপরে বিশেষ আস্থাও নেই তার। মেয়ে পুরুষের হৃদয়ের কারবারের অধ্যায়টাকে স্থূল পরিণামের একটা হাস্যকর প্রহসন ভিন্ন আর কিছু ভাবে না সে। শুক্লাকে ঘরে আনতে পারার আগে নিজেকেও এই প্রহসনের আবর্তে পড়ে বিলক্ষণ নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছিল বলেই হয়তো এটা তার চোখে আরো বেশি অবজ্ঞার ব্যাপার। শুক্লাকে সামনে বসিয়ে রেখে দাদা যদি একটু আনন্দ পায় আর ভাল থাকে অজিতেশের তাতে একটুও আপত্তি নেই। দাদার বেলায় অন্তত কোন রকম অঘটন সম্ভাবনার

দুর্ভাবনা তার মাথায় নেই। বউদি আপত্তি না করলে রাতের জন্য একটি সুশ্রী নার্স বহাল করার কথাও ভেবেছে সে। খরচ অনেক, কিন্তু খরচের ভাবনা অজিতেশ চক্রবর্তীর মাথায় নেই। টাকা-পয়সা স্রোতের মত আসছে যাচ্ছে। ঘুমুল তো ঘুমুল, নইলে নিরামিষ গল্পগুজবে দাদার রাত কেটে যাবে, ওদিকে বউদি বেচারী একটু ঘুমিয়ে বাঁচবে। কিন্তু বলি বলি করেও বউদির কাছে এখনো প্রসঙ্গটা তুলতে পারেনি অজিতেশ। তাব কেমন ধারণা স্থূল পরিণামের ব্যাপারটা যতই পুবনো হোক, হৃদয়ের কারবারের হাস্যকর প্রহসনটা দুজনেই জিইয়ে রেখেছে এখনো। দাদা এক অস্বাভাবিক চরিত্রের মানুষ বলেই তার পক্ষে এটা সম্ভব মনে করে সে, আর বউদি তো মেয়েই একটা—ছাঁচ বদল না হলে ওই প্রহসন তাদের আঁকড়ে ধরে থাকা স্বভাব।...কিন্তু দাদা যদি সত্যিই শুক্লাকে ধরে টানাটানি শুরু করে, নার্স আনার কথাটা তুলতেই হবে। এই মুহূর্তে অজিতেশ চক্রবর্তীর মুখখানা থমথমে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। কর্তব্যের দায়ে।

কিন্তু ওই মুখের দিকে তেমন নজর নেই অনুপমবাবুর। ভাই এবং স্ত্রী দুজনের দিকেই একবার করে তাকিয়ে স্বল্প নীরবতাটুকু উপভোগ করলেন যেন, তারপর সহজ সরল গলায় স্ত্রীকে বললেন, শুক্লার মুখখানা দেখ একবার, আচ্ছা, ও আমাকে আজকাল এত ভয় করে কেন বল তো!

শুক্লার কানের ডগায় লালের আভাস। ঘর ছেড়ে চলেই [illegible] এতক্ষণে, স্বামীর অমন গম্ভীর মুখ দেখে যেতে পারছে না।

শ্রীলেখা তাড়াতাড়ি জায়ের পক্ষ নিয়ে বলল, [illegible] কেন, কি ভাবে চলেছ তুমি নিজে খেয়াল কর? [illegible] ছিলে কেন?

জবাব দিলেন না। হাসি ভরপুর দু'চোখ স্ত্রীর মুখ [illegible]

মুখের ওপর উঠে এল। শাড়ির আঁচলটা আঁট করে গলায় বুকে জড়ানো। আরো ভাল লাগছে। চেয়ে আছেন, ভারী মজার কিছু রসদ পেয়েছেন যেন।

দাদা—!

শ্রীলেখা আর শুক্লা ঈষৎ উদ্‌বেগে ঘাড় ফেরাল। অনুপম বাবুও। কৌতুক চিকানো চোখে বিস্ময়ের আভাস।—কি রে?

তোমাকে স্পষ্ট করে একটা কথা বলে রাখা দরকার।

ভায়ের মুখখানা এবারে একটু পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন অনুপম বাবু। দু'হাত জোড় করে গলার স্বর যথাসম্ভব করুণ করে বলে উঠলেন, সত্যি বলছি সার, মা কালীর দিব্যি, আমি একেবারে নিরপরাধ, আমাকে মিছিমিছি ওরা ধরে এনেছে—

প্রায় আসামীকেই যা বলতে শুনতেন আগে অবিকল সেই রকম করে বললেন। আগে অর্থাৎ এবারের প্রমোশনটা পাবার আগে। এই প্রমোশন পাওয়ার পর ভাইয়ের সঙ্গে আসামীদের প্রাথমিক যোগাযোগ কমই হয়। এই রসিকতা সত্ত্বেও কারো মুখে হাসি ভাঙল না দেখে অনুপমবাবু ভিতরে ভিতরে বিস্মিত। তেমনি অনুচ্চ কঠিন স্বরে অজিতেশ বলল, তোমার বোঝা উচিত তুমি রোগী, রোগীর মতই তোমাকে থাকতে হবে, তা না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুপমবাবুর এতক্ষণের খুশি ভাবটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল। আহত বিস্ময়ে ভাইয়ের দিকে চেয়ে থমকে রইলেন খানিক। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যবস্থা, তাড়িয়ে দিবি এখান থেকে?

ভাইয়ের মুখের গাম্ভীর্যের ওপর বেদনার ছায়া পড়-পড় হল। কিন্তু পড়ল না, অপ্রিয় কর্তব্যবোধে অজিতেশ সচেতন। জবাব দিল, সুস্থ থাকলে এসব সেন্টিমেন্টাল কথা বলে নিজে যদি আনন্দ

পাও তো আলাদা কথা। ভিন্ন ব্যবস্থা বলতে আমি কি বলছি একটু ভাবলে নিজেই বুঝতে পারবে—তার যাতে দরকার না হয় সেইভাবে চল।

মুখের দিকে চেয়ে অনুপম বাবু শুনলেন, ঠোঁটের ফাঁকে এক ধরণের তিক্ত হাসি দেখা দিল। আবো কয়েক নিমেষ চেয়ে থেকে বললেন, আমার এক বন্ধুর মায়ের মাথাব গোলমাল হয়েছিল, ডাক্তার সেই বন্ধুকে বলেছিল বাড়িতে একজন থাকা দরকার যাকে পেশেণ্ট একটু ভয়-টয় করে আর মানে—তোদের ডাক্তারও তোকে এই গোছেব কিছু বলে গেছে ?

আজিতেশের বিড়ম্বিত মুখ। বাইরে সে ডাকসাইটে অফিসার, কিন্তু দাদার সামনে এখনো নিজেকে সে প্রয়োজন মত কঠিন করে তুলতে পারে না। জবাবে দাদার মুখের ওপব একটা বিরক্তি ভাব ছুঁড়ে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। যাবার আগে শ্রীলেখাকে ডেকে গেল, বউদি শুনে যাও—

পাছে ভাসুরের সামনে একলা পড়তে হয় আবার, সেই ভয়ে শ্রীলেখার আগেই শুক্লা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তার পিছন পিছন দেওরের ঘরে এসে দাঁড়াল শ্রীলেখা। গলায় আর গায়ে জড়ানো শাড়ির আঁচলটা খুলে কাঁধের দিকে ছুঁড়ে দিল শুক্লা, তারপর ধুপ করে শয্যায় এসে বসল। তার ওপর দিয়ে যে বেশ একপ্রস্থ ধকল গেছে ঘরের অন্য দুজনকে সেটা বুঝিয়ে দিল। ওই রকম করে ছুড়ে দেওয়ার ফলে আর বসার অসহিষ্ণু ঝাঁকুনিতে শাড়ির আঁচলটা কাঁধের আশ্রয়েও থাকল না তেমন, চার ভাগের তিনভাগ শয্যায় স্খলিত হয়ে পড়ল। কিন্তু শুক্লার সেদিকে চোখ নেই বা থাকলেও আর পরোয়া করে না।

শ্রীলেখা আড়চোখে ওকে দেখে নিল একবার। ওর ব্যাপারে

স্বামীর কিছু মানসিক প্রতিক্রিয়ার হদিস পায়, কিন্তু মুখ ফুটে সেটা প্রকাশ করে না কখনো। দেওয়রের দিকে তাকাল।

অজিতেশ চিন্তিত মুখে কাছে এসে দাঁড়াল।—আজ তুমি অপিসে যাচ্ছ?

ঠিক বুঝতে পারছি না···যাব?

আজ না গেলেই ভাল হয়—

শুক্লা বলে উঠল, ভাল হয় কি, আজ তোমাব অপিস যাওয়া হতেই পারে না—দুপুরে ডাকাডাকি শুরু করলে তখন আমি কি করব!

একটা উদ্গত ব্যথা জোর করেই ভিতরে চাপা দিল শ্রীলেখা। ওর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, যাব না তাহলে।

ঘরের মধ্যে একবার পায়চাবি করে নিয়ে অজিতেশ আবার সামনে এসে দাঁড়াল।—অবস্থা সুবিধের নয় বুঝতেই পারছ, এমনিতে দাদার মাথা আর ভাবনা-চিন্তা আমাদের থেকে ঢের বেশি সজাগ, কেবল কতগুলো ব্যাপারে অবশেসন···ডক্টর সিনহা বলছিলেন এ-সব কেসগুলোই হ্যাণ্ড্‌ল করা কঠিন হয়ে পড়ে।···তাই আমাদের, বিশেষ করে তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে, এ-অবস্থায় সর্ব ব্যাপারে আমরা যদি শুধু তোয়াজ করে চলি তো সেটা ওই রোগটাকেই তোয়াজ করা হবে—দাদা যে আমাদের কতখানি সেটা নিজেও সে খুব ভাল করে জানে, আর সেই জন্যেই মাঝে মাঝে নিজের ওপর জুলুম করে এক ধরণের আনন্দ পায়···পারসিকিউশান ম্যানিয়া গোছের কি যেন একটা বলছিলেন ডক্টর সিন্‌হা—যাক, বাইরে অন্তত তুমি আর একটু শক্ত হতে চেষ্টা কর, দাদার পারসোন্যালিটির সামনে সর্বদাই যদি ও-রকম মিইয়ে থাক, তাহলে তো মুশকিল—

দেওরের মুখের দিকে শ্রীলেখা চুপচাপ চেয়েই রইল শুধু। দাদার

ব্যক্তিত্বের সামনে এই হোমরাচোমরা ভাইটিরই যে কি অবস্থা হয় তাও তিনি অনুভব করতে পারেন। আজ অবশ্য একটু ব্যতিক্রম হয়েছে, মেজাজ আর বিরক্তি দেখিয়ে দাদার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।···চিকিৎসাগত কারণে এর হয়তো প্রয়োজনও আছে, কিন্তু তবু কোথায় যেন লাগে।

অনেকক্ষণ সময় গেছে, অজিতেশ ব্যস্ত মানুষ, নীচে এতক্ষণে কত লোক জমে গেছে ঠিক নেই। চিন্তাচ্ছন্ন মুখেই সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দরজার দিকে এগিয়েও শ্রীলেখা থামল আবার, শুক্লার দিকে তাকাল। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে শুক্লা দু'পা দোলাচ্ছে। আর তার দিকেই চেয়ে আছে।

কি বলতে গিয়েও বিরক্তিতে শ্রীলেখার দুই ভুরু কুঁচকে গেল একটু, আবার হেসেও ফেলল, সস্নেহ ধমকের সুরে বলল, ঠিক্ হয়ে বোস দেখি, তোর দিকে তাকালে আমারই চোখে লাগে এক-এক-সময়।

লজ্জা পেয়ে শুক্লা স্খলিত আঁচলটা তাড়াতাড়ি বক্ষাবাসের ওপর তুলে দিল। ফিক্ করে হেসেও ফেলল তারপর।—কেমন লাগে বল তো?

বিরক্তি সত্ত্বেও হালকা ভাবটুকু বজায় রাখতে চেষ্টা করল শ্রীলেখা, পল্‌কা অনুশাসনের সুরে বলল, ছাখ, আমি তোর অনেক বড়, দিদি! চটুল প্রসঙ্গ বাতিলও করল তৎক্ষণাৎ, মনের ওপর তো দুর্ভর চিন্তার বোঝা চেপেই আছে। পরামর্শ চাইলে শুক্লা খুশি হয় জানে, তাছাড়া উদ্‌বেগই বা কাঁহাতক্ চেপে রাখবে। বলল, আজ একদিন না হয় অপিস কামাই করলাম, কিন্তু এভাবে কি করে চলবে?

শুক্লা তক্ষুনি সাদা রাস্তা বের করে ফেলল, বলল, চাকরি ছেড়ে দাও না, কি দরকার, তোমার চাকরি করাটা দাদাও তো ঠিক পছন্দ করেন না—

শোনামাত্র ভিতর থেকে একটা অসহিষ্ণুতা ঠেলে উঠতে চাইল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা গেল না, ভিতরেই সেটা ঠেলে নামাতে হল। তার অসহায় অবস্থাটা ঠিক ঠিক কে বুঝবে। এমন অবস্থা যে রাগ করাও সাজে না। শুক্লার মতে চাকরি করা দরকার নেই, কারণ ওর স্বামী মোটা রোজগার করে, আর ছোট দেওরও বোম্বে থেকে মাস গেলে ভাল টাকা পাঠায়। তাদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব এই দুই ভাই নিয়েছে বটে। শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, দাদাকে যে সত্যিই ভালবাসে তারা শ্রীলেখা সেটা অস্বীকার করে না। কিন্তু এই দুজনের কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসার পুঁজির ওপর নির্ভর করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে? চাকরি ছাড়ার কথা শুক্লা আরো একদিন বলেছিল। তার যুক্তি, ভাসুর সুস্থ হয়ে উঠে আবার লেখা ধরলেই মোটামুটি যা রোজগার হবে, দুজনের হাতখারচা তাতেই চলে যাবে, মনুষ্যত্ব না খোয়ালে বাকি দায়িত্ব ভাইয়েরা ঘাড় পেতে নিতে বাধ্য।

এই বিপাকে পড়ার ফলে চাকরি ছাড়ার কথাটা শুক্লা সাদা বুদ্ধিতেই বলে। সমস্যার আর কোন সমাধান তার মাথায় আসে না। কিন্তু ওই লোক সুস্থ হয়ে লেখার মারফত আবার মোটামুটি কিছু রোজগার করবে, আশার এই আলোটা কেন যেন প্রায় নিষ্প্রভ শ্রীলেখার চোখে। লিখুক বা না লিখুক, রোজগার হোক বা নাই হোক, সুস্থ হয়ে উঠলেই শ্রীলেখা বাঁচে। এরকম এই সামান্য চাকরিটাকেই সে একমাত্র সম্বলের মত আঁকড়ে ধরে আছে। এই চাকরি নিয়ে স্বামী অনেক সময় ঠাট্টা-ঠিসারা করেছেন, মেজাজ তপ্ত থাকলে ঠেসও দিয়েছেন, তবু। মাইনে এখন সার্বসাকুল্যে চারশ' টাকার মত। তার থেকে মাস গেলে আড়াইশ' টাকা ছেলের দার্জিলিং কনভেন্ট-এর ফাদারকে পাঠায়। একটাই ছেলে, আর তার বয়েস মাত্র নয় এখন, কিন্তু দেওরদের আগ্রহে তাকে নিজের কাছে রাখতে পারেনি।

এক বছর হল ওকে দার্জিলিংয়ে পাঠাতে হয়েছে। দেওররা, বিশেষ করে অজিতেশ মস্ত একজন করে তুলবেই ওকে। দার্জিলিংয়ের পাঠ শেষ হলে সেখান থেকে ছেলেকে চালান করা হবে দেরাদুনে মিলিটারি কলেজে। বড় দেওর পাকাপাকি ব্যবস্থা করে রেখেছে। ভাইপো স্বাধীন দেশের সেনাবাহিনীর যে সর্বাধ্যক্ষ হয়ে বসবে না একদিন কে বলতে পারে ? সে-রাস্তায় তাকে এগিয়ে দিতে কসুর করবে কেন ?

এ ব্যবস্থায় শ্রীলেখার সায় ছিল না খুব। একটা ছেলেকে কাছ-ছাড়াও করতে চায়নি। ছেলের বাপের মাথা তখন বেশ গোলমেলে রাস্তায় চলেছে, অতএব তার মতামতের দাম কেউ দেয়নি। বড় দেওর কারো কোন মতামতের অপেক্ষাতেও থাকেনি, নিজের উৎসাহেই সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। শ্রীলেখার মনে যা-ই থাক, শেষ পর্যন্ত আপত্তি করেনি তার দুটো কারণ। নান্নু, অর্থাৎ ছেলে নয়নকে এ-বাড়ির এই পরিবেশে রাখতে তার বরাবরই আপত্তি। এখানে হামেশাই পুলিশের আনাগোনা, কেবল বড় বড় চুরি-ডাকাতির প্রসঙ্গ, ধর-পাকড়ের জল্পনা। আদরের ভাইপো কাকার সঙ্গে থেকে সর্বদাই সে-সব শুনত। কাকা এক একদিন থানাও নিয়ে যেত তাকে। অনুপম চক্রবর্তীর ভাবনা-চিন্তা যত বাঁকা পথেই চলুক, এ-ব্যাপারে খুঁতখুঁত করতেন। প্রায়ই বলতেন, নান্নুকে অন্য কোথাও রাখতে পারলে ভাল হত···এই রামকৃষ্ণ মিশনের কোন হোস্টেলে-টোস্টেলে···

ওদিকে কাকা অজিতেশও ভাইপোকে এখানে রাখতে চায় না। সে বলে, সর্বদা চোখের ওপর বাপের ওই অবস্থা দেখলে ছেলেটার পক্ষে খুব খারাপ হবে, ডাক্তারের সঙ্গেও পরামর্শ করেছি, ওকে এখানে রাখা চলতে পারে না, আমি একটা ভাল ব্যবস্থা করেছি, খবরদার আপত্তি কর না—

সব ব্যবস্থা করে ছেলেকে নিয়ে তার কাকা দার্জিলিং রওনা হল দেখে অনুপমবাবু প্রথমে অবাক, পরে প্রায় ক্রুদ্ধ। দার্জিলিংয়ের পর দেরাছনে মিলিটারি কলেজে পড়ানোর সঙ্কল্প অজ্ঞাত এখনো। শ্রীলেখা নিজে তো গোপন করেইছে দেওরকেও বলতে নিষেধ করেছে। সে-সময় এলে তখন দেখা যাবে। নানুকে দার্জিলিংয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানো হচ্ছে শুনেই অনুপম চক্রবর্তী তেতে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, ছেলেকে সাহেব বানাতে মাসে খরচ লাগবে কত? নিজেরা তো ভাইদের গলগ্রহ হয়েছি, ওরা বলল বলেই ছেলেটাকেও এভাবে ওদের কাঁধে চাপিয়ে দিলে?

শ্রীলেখা জবাব দিয়েছে, কি করব, অজুর এত ইচ্ছে, এত আগ্রহ—

দেওর অজিতেশ আর শ্রীলেখা একেবারে সমবয়সী। দুজনারই বয়েস তেত্রিশ এখন। নাম ধরে ডাকার ব্যাপারটা অজিতেশই চালু করেছে। বিয়ের পরে বয়েসের হিসাব নিয়ে বলেছিল, আমি তোমার থেকে এগারো দিনের বড়, দুজনেই দুজনকেই নাম ধরে ডাকব—

শ্রীলেখা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, আমি তোমার থেকে ছ' বছরের বড়, তোমার দাদার বয়েসটাই আমার বয়েস—আমি নাম ধরে ডাকতে পারি, কিন্তু তুমি বউদি না বললে তোমার কানের দিকে হাত যাবে—

...হ্যাঁ সেই আনন্দের দিনে আজকের এই কৃতী দেওরকে শ্রীলেখা অনায়াসেই এমন কথা বলতে পেরেছে। বাইরের লোকজনের সামনে অবশ্য নাম ধরে ডাকে না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আটকায় না।

ওই জবাব শুনেও অনুপম চক্রবর্তী ঠাণ্ডা হতে পারেননি, সশ্লেষে বলে উঠেছিলেন, শুধু অজুর ইচ্ছে আর আগ্রহ কেন, ছেলে মস্ত সাহেব হবে, তুমি খুশি হওনি?

মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে শ্রীলেখা জবাব দিয়েছিল, জানি না, এক তোমার কথা ছাড়া আর কিছু নিয়ে ভাবার সময় হয় না আমার। যাক, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, নান্টুর খরচটা আমি কারো ঘাড়ে চাপাব না, যতদিন সম্ভব আমি নিজেই চালাব।

এই নিয়ে দেওয়রের সঙ্গে ঝকা-ঝকি গেছে একপ্রস্থ। নান্টুর ব্যাপারে কাউকে মাথা গলাতে দিতে রাজি নয় অজিতেশ। খরচের ব্যাপারেও না। মিষ্টি কথায় তাকেও বোঝাতে হয়েছে। শ্রীলেখা বলেছে, তোমরাই সব করছ, কিন্তু এই একটা ব্যাপার আপাতত অন্তত আমার হাতে ছেড়ে দাও, নইলে তোমার দাদার মেজাজ আরো বিগড়ে যাবে--তাছাড়া এ চাকরিও তো তোমার জন্যই, নইলে এ বাজারে আমাকে কে ডেকে জিজ্ঞেস করত ?

সেই থেকে নয়নের সব খরচ সে-ই দিয়ে আসছে। এবারের প্রমোশনটার আগে পর্যন্ত খুবই কষ্ট হয়েছে, ছেলের খরচ পাঠানোর পর কিছুই প্রায় থাকত না। প্রমোশনের পর সব মিলিয়ে চারশ' টাকার কাছাকাছি হাতে পায়। ছেলের আড়াইশ' টাকা পাঠানোর পর হাতে থাকে দেড়শ'র মত। কিন্তু মাস গেলে দেখা যাচ্ছে, এ টাকারও কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নিজের হাত-খরচ যাতায়াত চালিয়ে, একটা তুটো জামা-কাপড় কিনে আর স্বামীর জন্য একটু বাড়তি ফল-টলের ব্যবস্থা করতেই মাসের শেষে হাত যেমন খালি তেমনি খালি। অবশিষ্ট যেটুকু থাকে, তার নাম তৃপ্তি। এটুকুও খোয়াবার প্রসঙ্গ উঠলে শ্রীলেখা চোখে অন্ধকার দেখে।

॥ দুই ॥

ঘরে পা দিয়ে দেখে মানুষটা শয্যা ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন। থমথমে মুখ, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে বলছেন কি। বেশ খানিকক্ষণ পর্যন্ত শ্রীলেখাকে লক্ষ্যই করলেন না। তারপর হঠাৎই চোখ পড়ল। কাছে এগিয়ে এলেন। বেশ কাছে। দস্তুরমত লম্বা মানুষ, তাই একটু ঝুঁকে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কি?

না, তুমি কি দেখছিলে?

শ্রীলেখা হাসতে চেষ্টা করল একটু। জবাব দিল, দেখছ তো তুমি আমাকে!···ও, হ্যাঁ, সব কেমন বদলে যাচ্ছে তাই দেখছিলাম···

কি বদলে যাচ্ছে ?

···কালকের ওই পাবলিশারটা···দক্ষিণেশ্বরের রাস্তার ছেলেগুলো অজু···শুক্লা

শ্রীলেখা চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে আছে। বাইবের দেয়াল ঘড়িতে ঢং করে শব্দ হল একটা। ঝুঁকে পরদা ঠেলে ঘড়িতে সময় দেখতে গিয়ে শ্রীলেখার বুকের সঙ্গে বুক ঠেকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলেখার সর্বাঙ্গে স্মৃতির শিহরণ একটা।·· পাঁচ বছর আগের কথা। অজিতেশের সেদিন বিয়ে। বাড়িতে সকাল থেকে সেদিন বেশ জনাকতক অতিথি অভ্যাগত উপস্থিত। বাড়ির একমাত্র গৃহিণী শ্রীলেখার তখন ব্যস্ততার অন্ত নেই।· হাতে কি সব জিনিস নিয়ে ব্যস্ত পায়ে সেই বিয়ে বাড়ির একটা ঘোরানো বাঁকেই পা দিতেই সামনাসামনি সংঘর্ষ। হন্তদন্ত হয়ে বাঁকের এদিক থেকে অনুপম বাবু আসছিলেন। সংঘর্ষ তারই সঙ্গে। হাতের জিনিসগুলো ছিটকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। ছিটকে পড়তে পড়তে টাল সামলেছে শ্রীলেখা। তার রাগই হয়ে গিয়েছিল, বলে উঠেছিল, একটু দেখে শুনে চলবে তো নাকি।

ব্যস্ত অনুপমবাবুও ছিলেন, পাল্টা রাগ তিনিও করতে পারতেন। কিন্তু রাগ কবেননি বা রাগের জবাব দেননি। মাটিতে ছিটকানো জিনিসগুলোর ওপর থেকে দু'চোখ তার মুখের ওপর এসে স্থির হয়েছিল। না স্থিরও হয়নি ঠিক, তার মুখে আর আঁচল-খসা বুকে ওঠা-নামা করছিল কয়েক দফা। তারপর বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে, বেলা তখন আড়াইটে-তিনটে হবে। শ্রীলেখা সবে তখন খেয়ে উঠেছে। তার আগে অনেকবার গম্ভীর দেখেছে মানুষটাকে, চোখা-চোখি হতেও কেমন যেন লেগেছে। শ্রীলেখার মাথাও তখন শুধু আসন্ন বিয়ের দায়িত্বগত দুশ্চিন্তা।

খেয়ে ওপরে পা দিতেই দেখে মানুষটা সিঁড়ির ওধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মনে হল তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। সশঙ্কে তাকাতেই চোখের ইশারায় ডেকে সোজা ছাদে উঠে গেলেন। ছোট বাড়িতে এত লোক আসার দরুণ ছাদের খুপরিকোঠা ভিন্ন নিরিবিলিতে কথা বলার জায়গাও নেই। ভয়ে আর অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক দুরুদুরু শ্রীলেখার, অনেক দিনের অনেক হাঙ্গামা-হুজ্জুতের পর দেওরের এই বিয়ে হতে যাচ্ছে। আবার কি ফ্যাসাদ বাধল কে জানে।

ওপরের খুপরি ঘরে ঢুকে মানুষটার মুখ দেখে আরো ঘাবড়ে গেল। ন্যাড়া চৌকিটাতে বসে ভুরু কুঁচকে দাঁতে করে নীচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

কি হয়েছে ?

খুব বিপদ। এগিয়ে এস।

শ্রীলেখা চকিতে কাছে এসেছে, তাব চোখে মুখে উৎকণ্ঠা।

বোসো।

নিজের অগোচরে গা ঘেঁসেই বসেছিল। মানুষটার দু'চোখ তার মুখের ওপর অনড় খানিক।

কি হয়েছে বলছ না কেন ? কার বিপদ ?

আমার।

তার মানে ?

সেই তখন থেকে শরীরটা কেমন করছে।

উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল মুখ শ্রীলেখার।—কখন থেকে।

বারান্দায় সেই তোমার সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর থেকে।

শোনার পরেও দুর্বোধ্য বিস্ময়ে শ্রীলেখা বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই মুখে রক্ত কয়েক ঝলক।—ধেৎ!, অসভ্য কোথাকার!

এক ঝটকায় উঠে দরজার দিকে ছুটেছিল। পারেনি। তার

আগেই তাকে ধরে ফেলে দস্যুর মত এক হাত আগলে রেখে অন্য হাতে সেই দিনে দুপুরে দরজা বন্ধ করে ফেলেছিল।

···সেটা একটা বিশেষ দিনের বিশেষ ঘটনা। নইলে তার আগে আর পরে অজস্রবার মানুষটার সব-ভালর মধ্যে ওই গোছের দুর্বার দেহ-তৃষ্ণা অনেক সময় অস্বাভাবিক মনে হয়েছে তার। ভালমন্দ সুখ-দুঃখের মানসিক অবস্থার যে-কোন ব্যতিক্রমে তার কাছে ছুটে এসেছে, দখল বিস্তারের বিস্মৃতির অতলে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছে।

ঈষৎ তীক্ষ্ণ চোখে শ্রীলেখা নিরীক্ষণ করল তাঁকে। না, আজকের এই স্পর্শে কোন সচেতন মানসিক ব্যতিক্রম নেই।

···সাড়ে ন'টা···তুমি এখনো আপিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে না যে?

আজ যাচ্ছি না।

কেন, আজ কিসের ছুটি?

সহজ হালকা সুরেই শ্রীলেখা জবাব দিল, ছুটি করে নিলাম।

আপিস কামাইয়ের হেতু বুঝেছেন অনুপমবাবু। তাই ক্রুদ্ধ। সরোষে বলে উঠলেন, কেন যাবে না? আমার জন্যে? আমার জন্যে ক'দিন আপিস কামাই করতে পারবে?

একদিন তো করি।

অত ভাগ্যের দরকার নেই, রেডি হয়ে নাও, আপিস যাও!

শ্রীলেখার রাগ হয়ে গেল। দেওরের শক্ত হতে না পারার অনুযোগও মনে পড়ল তক্ষুনি। পাল্টা ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার খুশি আমি যাব না, তোমার তাতে কি?

অনুপমবাবু থমকালেন একপ্রস্থ। চেয়ে রইলেন খানিক, তারপর ঠোঁটের ফাঁকে হাসি উঁকিঝুঁকি দিতে থাকল। কিন্তু সেইসঙ্গে কি

এক অগোচরের বেদনাও যেন ভিতর থেকে উঠে ঠোঁটের ওই হাসির সঙ্গে মিশেছে।...ডাগর চোখে হরিণী দেখছেন। আত্মরক্ষার দায়ে অসহায় হরিণও কি হাত পা ছোঁড়ে না, শিং নাড়ে না? তাঁর পোষা হরিণ, তাঁর কাছ থেকে কোন ক্ষতির ভয় নেই, তাই এই ব্যতিক্রমটুকু ভাল লাগছে।...কিন্তু ওই হাঙরটার, অর্থাৎ শ্রীলেখার খোদ অফিসার ওই নারাণ সাহেবের কেমন লাগবে? অনুপমবাবুর বদ্ধ ধারণা, নরম-সরম হরিণের মাংস ওই চরিত্রের লোকদের ভাল লাগেই। লোকটা একদিন মাত্র এই বাড়িতে এসেছিল, তাও ভাইয়ের খাতিরেই এসেছিল যেন। ব্যস্তসমস্ত তাঁর এই আদরের হরিণী সেদিন তাকে হিড়হিড় করে নীচে টেনে এনেছিল, তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে হাসি হাসি মুখে তাঁকে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, আর তারপর অজু আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সুতৎপর আর সুসভ্য হাসিখুশির আড়ালে সুচতুর দৃষ্টি লেহন দেখে অনুপমবাবু সেদিনই বুঝেছিলেন নারায়ণ হাঙরের হরিণী বড় পছন্দ। সেই পছন্দের নজির চাকরির দেড় বছর না যেতে ওই প্রমোশন। সুখবর শুনে অনুপমবাবু হেসেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নারায়ণের অনুগ্রহে ক'জনকে টপকালে।

অপ্রস্তুত মুখ করে শ্রীলেখা জবাব দিয়েছিল, তাতো জানি না।

...হরিণীর এই গোছের ফোঁসফোঁসানি দেখে ওই হাঙরটা কি ঘাবড়াবার পাত্র, না কি আরো বেশি মজা পাবে? তবু এরকম ফোঁস করে উঠতে যে পারে অনুপমবাবুর চোখে এইটুকুই উপভোগ্য ব্যতিক্রম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুর্বোধ্য যন্ত্রণার মত ভিতরে ভিতরে...বদলাচ্ছে, সকলে বদলাচ্ছে; কলেজ স্ট্রীটের পাবলিশার...রাস্তার সেই ছেলেগুলো...অজু...শুক্লা...শ্রীলেখা...

মাথাটা হঠাৎ যেন আবার ঝিমঝিম করে উঠল কেমন। ঘরটা যেন দুলছে একটু একটু। শ্রীলেখা ঘরে ঢোকার আগে এই নিয়েই ভাবছিলেন তিনি, কালকের দিনটার কথা ভাবছিলেন, যত ভাবছিলেন মাথাটা তত বেশি ঝিমঝিম করছিল। এখন হঠাৎ আরো বেশি করছে। তাড়াতাড়ি শয্যায় আশ্রয় নিতে গিয়ে চেয়ারটার সঙ্গে ধাক্কা খেলেন একটা। কিন্তু খেয়াল করলেন না। শুয়ে পড়লেন। পুরু গদি আঁটা খাটটাও দুলছে বেশ। তবু শক্ত করে চোখ বুঁজে গত-কালের চিত্রটা চোখের ওপরে ভাসিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। সেই চিত্রের সঙ্গে বাড়ির এদের পরিবর্তনেরও যেন যোগ আছে একটা।

দুপুরে শুয়ে বসে অতিষ্ঠ লাগছিল। তার আগে লেখার চেষ্টায় মন দিয়ে ছিলেন। আপিসে যাবার আগে শ্রীলেখা কথা আদায় করে নিয়ে গেছিল সমস্ত দুপুরে পাঁচ সাত পাতা অন্তত লিখতেই হবে। অনুপমবাবু কথা রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, লিখতে বসেছিলেন। কিন্তু লেখায় মন বসছিল না, চিন্তাভাবনাগুলো যেন পাখা মেলে এক একটা এক এক দিকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল, সে-গুলোকে টেনে ঠেলে মাথার খাঁচায় এনে পুরতে গিয়ে ক্লান্তি এসে যাচ্ছিল। শেষে লেখা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। প্রথমে ঘরে তারপর বারান্দায় তারপর গোটা কয়েক পায়চারি করেছিলেন। শুক্লার ঘরের সামনে এসেও থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন একবার। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ মনে হল।...আশ্চর্য, দিনে দুপুরে মেয়েটা ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমোয় নাকি! পায়চারি করতেই বা কতক্ষণ ভাল লাগে? আবার

ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। হঠাৎ মনে হয়েছে বাইরে থেকে একটু ঘুরে এলে হয়। বাইরে থেকে মানে বইয়ের পাড়া থেকে। কলেজ স্ট্রীট কম করে তিন মাইল, বাসে উঠতেও বিরক্তি। ট্রাম বাসে আজকাল সকাল দুপুর রাত্তির নেই সর্বদাই ভিড়।

অদূরে কোথায় কোকিল ডাকছিল একটা। ক্লান্তি নেই, ডেকেই চলেছে। বহুক্ষণ ধরে অনুপমবাবু সে-ডাক শুনেও শুনছিলেন না। এবার সবকিছু ছেড়ে ওই ডাকই শুধু কানে আসতে লাগল। বাইরে বেরুনোর জন্যে উসখুস করে উঠলেন তিনি।

বেরুবার মুখেও থমকালেন আবার। শুক্লার ঘর বন্ধ, কাকে বলে যাবেন? বিকেল হতে না হতে হয়তো খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। সমস্যার সমাধানও হয়ে গেছে তক্ষুণি। লেখাকে একটা টেলিফোন করে গেলেই তো হয়। পাবলিশার মহলে এতদিন বাদে গেলে ফিরতে সন্ধ্যা তো হবেই। তাছাড়া জীবন ঘোষ এক গাদা প্রুফ দিয়ে বসিয়ে দেবেন কিনা কে জানে। প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল পাণ্ডু-লিপিটা তাঁর হাতে চালান করেছেন, ইতিমধ্যে বাড়ির লোকের জুলুমে পড়ে আর ও-মুখো হতে পারেন নি। কত প্রুফ জমে আছে ঠিক কি। আগে অবশ্য প্রুফ বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন সব পাবলিশার আর তাগিদ দিয়ে নিয়েও যেতেন, কিন্তু বছরখানেক ধরে যে অবস্থা যাচ্ছে ইদানীং ওই কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়—বোমা-বাজীর হিড়িকে দিনের মধ্যে পাঁচ বার করে দোকানের দরজা বন্ধ করতে হয়—কাজ কারবার সব সিকেয় উঠতে বসেছে—এর মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে প্রুফ দেওয়া নেওয়া কে করতে চায়?

অনেকক্ষণ টেলিফোন ধরে থাকার পর সাড়া পেলেন, কিন্তু শুনলেন শ্রীলেখা দেবী টিফিনে গেছেন, কতক্ষণে ফিরবেন ঠিক বলা যাচ্ছে না।

এমনিতেই পাখির খাওয়া, টিফিন যা করে অনুপমবাবুর জানা আছে। হয়তো এই অবকাশটুকুতে কোন নিরিবিলিতে বসে চোখ বুঁজে বিশ্রাম করে। মিনিট পনের বাদে আবার ফোন করলেন, সেই একই জবাব, টিফিনে গেছেন।

হঠাৎ একটু দুষ্টুমি মাথায় চাপল অনুপমবাবুর। লাইনটা লেখার অফিসার নারায়ণ সাহেবের ঘরে দিতে বললেন। তাঁকেই অনুরোধ করবেন লেখাকে খবরটা দিতে। ভদ্রলোক লেখাকে একবার ঘরে ডাকার সুযোগ পেয়ে খুশি হবে বলেই বিশ্বাস। লেখার বিড়ম্বিত মুখখানা কল্পনা করে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা পড়ল। তাঁর দুষ্টুমিটা লেখা ঠিকই বুঝতে পারবে, অফিসারের ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমে রাগত মুখে নিজের জায়গায় ফিরবে, তারপর দুষ্টুমির কথা ভেবে মনে মনে হাসবে।

হ্যালো!

মিস্টার নারায়ণ?

নহী জি, সাহাব টিফিন মে গিয়া।

যাঃ কলা! রিসিভার রেখে দিলেন।

টিফিন আওয়ার্স মানে সকলেরই টিফিনের সময়। এর মধ্যে একজনের সঙ্গে আর একজানর টিফিনে যাওয়ার যোগটাও মনে আসছে কেন তাঁর? কোন মানে হয় না তবু আসছেই মনে। নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে নীচে নেমে এলেন তিনি।

না, ডাক্তার বা বাড়ির লোক যা ভেবেছে তা নয়। যাবার সময় কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত তিনি বাসেই গেছিলেন, আর তার ঘণ্টা-খানেক বাদে কালীতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত খবরের কাগজের এক সুপরিচিত দুঁদে রিপোর্টারের গাড়িতে। তারপর থেকে অবশ্য যাতায়াতের সবটুকুই পায়ের ওপর দিয়ে গেছে।

···মগজের মধ্যে একটা কাটা-ছেঁড়া শুরু হয়েছিল জীবন ঘোষের সঙ্গে মিনিট কয়েকের বাক্যালাপের পরে। বছর তিনেক আগেও এই লোক তাঁকে দেখলে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কৃতার্থ মুখ করে বলেছেন, আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য, ভিতরে আসুন—ওরে চা নিয়ে আয়, নয় তো ভাল দেখে আগে ডাব নিয়ে আয় একটা, পরে চা, হবে'খন।

বছরখানেক হল, সব প্রকাশকেরই আপ্যায়ণের এই রীতি বদলেছে। অনুপম বাবুর তখনো মনে মনে ধারণা, এ অঞ্চলে অবিরাম হামলার ফলে সকলের ব্যবসা রাখা দায় হয়েছে, আপ্যায়ণের মেজাজ থাকবে কি করে। কত প্রকাশক তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানিয়েই দিয়েছে, আর তারা নতুন কিছু ছাপছে না, পুরনোগুলো সামাল দিতে পারলেই বাঁচে।

তাঁকে দেখে জীবন ঘোষ অভ্যস্ত বিনয়েই হাসতে চেষ্টা করলেন একটু, তারপর অপেক্ষমান ক্রেতার ক্যাশমেমো লিখতে লিখতে একবার বাঁকা চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খবর?

ক্রেতা চলে যাবার পরেও তাঁকে ভিতরে ডাকা হল না দেখে ভিতরে ভিতরে অবাক হলেন একটু। অগত্যা কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়েই বললেন, শরীরটা ভাল ছিল না, অনেকদিন আসতে পারি নি···কদ্দুর ছাপার ছাপা হয়েছ, অনেক প্রুফ জমে গেছে বোধ হয়?

চশমার ফাঁক দিয়ে জীবন ঘোষ গম্ভীর মুখে তাঁকে নিরীক্ষণ করলেন একদফা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে একজনের উদ্দেশে হুকুম করলেন, ওহে, সেই 'কণ্টক কাল' পাণ্ডুলিপিটা কোথায় রেখেছে নিয়ে এস তো—

অনুপমবাবু বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে। দুর্বোধ্য লাগছে। নানা রকমের

মানসিক ঝামেলার ধকলের মধ্যে প্রায় দু'বছরের চেষ্টায় এই উপন্যাস লিখে উঠেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর একটি লেখাও ছাপা হয় নি। না লিখলে ছাপা হবে কোথা থেকে। ঠিক তার আগের ছাপা কয়েকখানা বইও বাজারে তেমন কাটৃতি হয়নি—রাজনীতির যে আসুরিক খেলা চলেছে কয়েক বছর ধরে, তার সঙ্গে লোকের অভাব অনটন যে হারে বেড়ে চলেছে, এই অস্থিরতার মধ্যে সাহিত্যই প্রথম বলি হবে না তো কি? যাই হোক, দু'বছরের চেষ্টায় 'কণ্টক কাল' লেখাব পর মনটা ভরে উঠেছিল। এই যুগের ক্ষোভটাকেই মূর্ত করে তুলতে চেয়েছেন তিনি, বিশ্বাস—পেরেছেনও। এতদিনের ফারাকে নতুন বই লেখা হয়েছে শুনে প্রকাশকদের :মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে আশা করেছিলেন। টেলিফোনে দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলে কি-রকম যেন লাগল ; দিনকালের মারে এদের উৎসাহই যেন ঝিমিয়ে গেছে। শেষে নিজে একদিন এসে তাঁর প্রথম দিকের মাঝারি পাবলিশার জীবন ঘোষের হাতে পাণ্ডুলিপি দিয়ে গেছেন।

কাউন্টারের টেবিলের ওপর ধুলো-পড়া পাণ্ডুলিপিটা রেখে গেল একজন। যেমন বাঁধা ছিল তেমনি আছে। এক ঝলক কুইনিন উগরে দেবার মত জীবন ঘোষ ঝপ করে বলে ফেললেন, এটা নিয়ে যান, ছাপার সুবিধে হল না। অনুপমবাবু তেমনি হতভম্ব। মাথার ভিতরটা কি রকম যেন করে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপার? নাকের ডগা থেকে চশমাটা কপালে তুলে দিয়ে ড্যাবডেবে চোখে জীবন ঘোষ তাকালেন তাঁর দিকে।—বলব?··· আপনার বই কেন আজকাল কাটছে না, আর কেনই বা কোন পাবলিশার আপনার বই নিতে চায় না দেখার জন্যই আপনার কাছ

থেকে পাণ্ডুলিপিটা রেখেছিলাম।···পড়ে দেখলাম, আপনার এই নীতির কচকচি, নীতির ঝাঁঝ আর নীতির ছড়ি উঁচানো কার ভাল লাগবে—ত্নিয়ায় এক নিজেকে ছাড়া সকলকেই তো আপনি এক একটি জানোয়ার বানিয়ে ছেড়েছেন দেখছি—কি লেখা লিখতেন আগে আর এখন লিখাই লিখছেন—এ বই ছেপে কি আমি নিজের বুকের ওপর চাপিয়ে বসে থাকব।

মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছিল অনুপম বাবুর, দোকান ঘরটাও যেন একটু একটু তুলছিল। খানিক বসতে পারলে আবার সব ঠিক হয়ে যেত, পারেন নি। পাণ্ডুলিপিটা হাতে করে বেত্রাহতের মত বেরিয়ে এসেছেন। টলতে টলতে কলেজ স্কোয়ারে এসে একটা বেঞ্চিতে বসেছেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু ভাবতেই পারেন নি, মাথার মধ্যে কি যেন কেবল জট পাকিয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ বাদে আত্মস্থ হয়ে নিজের বিচারে বসেছেন। পাবলিশাররা সব তুর্দিনের অজুহাত দেখিয়ে তাকে বাতিল করেছে এটা আজই প্রথম বুঝলেন। জীবন ঘোষ স্পষ্ট কথা বলেছেন বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। বিচার শেষ হল। আর লিখবেন না ··হ্যাঁ, চেতনা নামে বস্তুটাকে নির্মমভাবে শলাকাবিদ্ধ করে ঘুমন্ত মানুষকে জাগাতেই চেয়েছিলেন তিনি, বেপথু মানুষকে মনের ঘরে ফেরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর হবার নয়।

পাণ্ডুলিপিটা খণ্ডখণ্ড করে স্কোয়ারের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। খানিকটা পিছন থেকে মেয়েলি গলার হাসি কানে আসতে ফিরে তাকিয়েছেন। ওধারের বেঞ্চটায় একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বসে, তুজনারই হাতে বইখাতা. কলেজ বা য়ুনিভার্সিটির ছেলে মেয়ে হবে। ওরা তাঁর দিকেই চেয়ে আছে আর হাসছে। আগে থেকেই লক্ষ্য করছিল হয়তো।

রোগাটে মেয়েটা হাত তুলে কাছে ডাকল তাঁকে। যেন সম্রাজ্ঞী বসে আছেন, হঠাৎ কোন দীন প্রজার প্রতি তুষ্ট।

মাথাটা সক্রিয় হতে থাকল অনুপম বাবুর, কৌতুক চেপে কাছে এলেন।

তরল গলায় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, মশাই কি হতাশ লেখক নাকি, জলে ও কি ভাসালেন ?

অনুপম বাবুও দেখছেন তাকে, হাসছেন। মাথা নাড়লেন, বললেন, যা ভেবেছ তাই, তোমরা কি পেলে ঘরে ফিরতে পারো সেই কথাই লিখেছিলাম···ওরা ভাবল ডাক্তার অপারেশনের ছুরি হাতে নিয়েছে, পছন্দ হল না।

ছেলেটা এক লাফে উঠে দাঁড়াল, হাতের আস্তিন গুটিয়ে কাছে এসে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, হোয়াট ডু ইউ মিন ? তাছাড়া আপনি ওকে তুমি করে বলছেন কোন্ সাহসে ?

অনুপমবাবু ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ওদিকে মেয়েটাও হঠাৎ যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল একটু, তাড়াতাড়ি উঠে এসে ছেলেটার হাত ধরে টেনে ফেরাতে চেষ্টা করল, আর সেই সঙ্গে চোখের ইশারায় তাকে চলে যেতে বলল।

অনুপমবাবু গেটের দিকে পা বাড়ালেন। হাসি পাচ্ছে, হঠাৎ প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে তাঁর। কিন্তু হাসলে আবার মুশকিল হতে পারে। মাথাটার মধ্যে আবার কি রকম যেন করছে। কড়া কিছু খেতে পারলে যেন ভাল লাগত···ওই তো। খানিক এগিয়ে সামনের কফিখানায় ঢুকে পড়লেন।

কফিখানা সরগরম। এক একটা ছোট টেবিলের চারধারে পাঁচ-সাতটা করে চেয়ার জড়ো করে দলে দলে ছেলে মেয়েরা সরবে জটলা করছে। তাদের সামনে খালি আধ-খাওয়া বা ভরাট কফির পেয়ালা,

বহু ছেলের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, প্রায় মেয়েরই কোলে বইয়ের পাঁজা, হাসি হাসি মুখে আলোচনা শুনছে, যে মেয়ে কথা বলছে তার আবার মুখের থেকে হাত বেশি নড়ছে।

যৌবনের কোলাহল, কিন্তু যৌবনের সুর বাজছে না কোথাও। এই পরিবেশে নিজেকে অপাঙক্তেয় অবাঞ্ছিত লাগল অনুপম বাবুর। একেবারে কোণের দিকে একলা একটা চেয়ার আশ্রয় করে বসে আছেন। বেয়ারা অর্ডার নিয়ে কখন কফির পেয়ালা দিয়ে গেছে তাও যেন হুঁস নেই। চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখছেন। আর মগজে যেন কি রকম কিরি-কিরি দাগ পড়ছে। হট্টগোলের অনেক শব্দ অনেক কথা কানে আসছে। না, প্রণয়-গুঞ্জন চলছে না কিছু, লেখাপড়ার কথা নয়, সিনেমা থিয়েটারের নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গও নয়। খানিক কান পাতার পরেই মনে হল, তামাম পৃথিবীর রাজনীতি যেন এখানে এসে মুক্ত দ্বার পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ভিয়েতনাম ভিয়েতকং চীন আমেরিকা রাশিয়া, সি, পি, এম, কংগ্রেস নকশালাইট ছাত্র ফেডারেশন···আরো কত কি।

কফির পেয়ালা ভুলে অনুপম বাবু ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছেন চারদিক, শুনতে চেষ্টা করছেন, বুঝতে চেষ্টা করছেন।···প্রকাশক জীবন ঘোষ মুখের ওপর তাঁকে কটু কথা বলে খুব কি অন্যায় করেছেন? আজকের ছেলেমেয়েদের এই যৌবনকে তিনি ধরতে পেরেছেন? বুঝতে পেরেছেন?···যে লেখকরা পেরেছে তারা কি লিখেছে, কি বলেছে? মাথার মধ্যে চিন্তাটা তালগোল পাকাতে লাগল অনুপম বাবুর। ঐ মেয়েগুলোর একজনাকও ছেলেগুলোর কোন একজনের অন্তঃপুরের দোসর হিসেবে কল্পনা করতে পারছেন না তিনি—এ কি তাঁর চোখের দোষ? কল্পনার পুষ্টির অভাব? কলেজ স্কোয়ারের সেই মেয়েটার চপল মুখ মনে পড়ল। ওই মেয়েটা

ওই ছেলেটার ঘরে যাবে? যেতে পারে। এখানকার অনেক মেয়েও হয়তো অনেক ছেলের ঘরে যাবে। কিন্তু ওরা কি পাবে? প্রিয় পাবে কেউ? প্রেয়সী পাবে? সেই পাওয়ার তৃষ্ণা যদি অবন্তী বিদীশা উজ্জয়িনীর পথে হারিয়ে গিয়ে থাকে, একালের লেখক তাহলে ওদের নিয়ে কোন্ ছবি আঁকছে?...প্রকাশক জীবন ঘোষ বললেন নীতির কচকচি নীতির ঝাঁঝ নীতির ছুরি উঁচানো চলবে না, কাউকে জানোয়ার বানানো চলবে না—সে-সবের উল্টোপিঠের এই চিত্রটা চলবে? এরই বা শুরু আর শেষ কোন্ লেখকের চোখে ধরা পড়েছে?

সচকিত হলেন। কয়েকটা ছেলেমেয়ে পায়ে পায়ে এদিকে এগোচ্ছে। এরা নবাগত। ঘরে আর তিল ধারণের জায়গা নেই বলে এদিকে আসতে বাধ্য হচ্ছে। ওদের সকলেরই চোখে মুখে বিরক্তি। অনুপমবাবু নিঃসংশয়, যৌবনের এই হাটে আধবয়সী একটা লোক জায়গা আগলে বসে আছে বলেই এই বিরক্তি ওদের। অনুপম বাবুর অপরাধী মুখ। এক চুমুকে ঠাণ্ডা কফির পেয়ালা খালি করে দিয়ে কফির পয়সা টেবিলে রেখে সব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

পাশ কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে পিছনে মেয়ে আর পুরুষ গলার মিশেল হাসি। কিন্তু অনুপম বাবুর পিছন দিকে তাকালেন না আর। অনধিকার প্রবেশ করেছেন, ওরা হাসবে নাতো কি?

পথ।

হ্যাঁ, পথই সব থেকে প্রিয় অনুপম বাবুর। বাড়ি নয়, ঘর নয়, আরামের শয্যা নয়—পথ। পথের আমন্ত্রণ দিনকে দিন যেন হৃদয় দিয়ে টানছে তাঁকে। অথচ তিনি পথে বেরুলেই শ্রীলেখার ভয়, অজুর দুশ্চিন্তা। পথের যে কি মায়া সে শুধু তিনিই অনুভব করতে শুরু করেছেন।

উত্তরে চলেছেন কি দক্ষিণে খেয়াল নেই। বিপরীত মুখী মানুষগুলোর মুখ দেখতে দেখতে চলেছেন। সবগুলো মুখে একটা করে উদ্দেশ্যের এঞ্জিন বসানো আছে—তারই দমে চলেছে সব। শুধু তিনিই উদ্দেশ্যশূন্য। তা কেন· দেখটাই তো উদ্দেশ্য।·· কিন্তু দেখে কি করবেন? না, লেখা তো ছেড়েই দিয়েছেন। ছেলে মরে গেলে মা যেমন পবে তাব শূন্য ঘবে ঢুকতে পাবে না—অথচ সেই ঘর ছেড়ে দূবেও মন সবে না—অনুপম বাবুব মনটাও তেমনি কবে তার মরা লেখাব চারদিকে ঘুরঘুর কবছে।

ঘ্যাঁচ কবে ঠিক পাশেই গাড়ি থামল একটা। অনুপমবাবু চমকে সবে দাঁড়ালেন। গাড়ির ভিতবে সশব্দ হাসি, একটা সুশ্রী মেয়েব কাঁধের পাশ দিকে ঝুঁকে গাড়িব চালক হাসিমুখে বলে উঠল, ঘাবড়ে গেছিলেন তো? ফুটপাথ ঘেঁষে এ-ভাবে রাস্তা দিয়ে চলেছেন, চাপাই পড়বেন কোন্ দিন—জোরালো কিছু প্লট ভাবছিলেন বুঝি?

মিষ্টি মুখে মেয়েটির থেকে চোখ টেনে নিয়ে চালাকের দিকে তাকালেন। খবরের কাগজের সেই পরিচিত হুঁদে রিপোর্টার—সঞ্জয় বোস। এককালে ছোট গল্প-টল্প লিখত, অনেকদিন আগে কোন এক সম্পাদকের দপ্তরে ছেলেটাব সঙ্গে পরিচয় এবং হৃদ্যতা। বছর তিরিশ একতিরিশ হবে বয়েস এখন, রিপোর্টার হিসেবে নাম হবার সঙ্গে সঙ্গে গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছে। লেখকদের কিছুটা অনুগ্রহের চোখে দেখে এখন—না লেখকদের কেন, অনেককেই। ডাকসাইটে অফিসার ভাই অজুও এই ছোকরাকে বেশ খাতির-টাতির করে লক্ষ্য করেছেন। ছেলেটার জোরালো ধরণের কথাবার্তার জন্য একে ভালই লাগে অনুপম বাবুর।

হাত বাড়িয়ে পিছনের দরজা খুলে সঞ্জয় বোস।—আসুন,

কোথায় যাবেন, নামিয়ে দিচ্ছি। উঠে আসুন না, পিছনে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল—

বাক্য বিনিময়ের ফুরসত না পেয়ে অনুপমবাবু তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। গাড়ি চলল। পাশের মেয়েটি আধা তেরছা হয়ে দুই একবার দেখে নিল তাঁকে। সঞ্জয় বোস জিজ্ঞাসা করল, যাচ্ছিলেন কোথায়?

চকিতে রাস্তার দু'দিক দেখে নিয়ে অনুপমবাবু জবাব দিলেন, শ্যামবাজারে দিকে—

সঞ্জয় বোসের হাতে স্টিয়ারিং, তাই সামনের দিকে চোখ। গলার স্বরে বিস্ময়, হেঁটে শ্যামবাজারের দিকে!'

বেশি হাঁটিনি, কলেজ স্ট্রীটে এসেছিলাম, রোদ নেই বলে হাঁটতে ভাল লাগছিল।

বেশ আছেন আপনারা। নতুন কিছু লিখছেন?

বুকের ওপর সরাসরি তীর বিঁধল যেন একটা। সেটা সামলাবার চেষ্টায় হাসতে চেষ্টা করলেন অনুপমবাবু। মেয়েটির তেরছা মুখ তাঁর দিকে আর একটু ফিরল। লেখক শুনেই সম্ভবত। মেয়েটির সিঁথিতে সূক্ষ্ম সিঁদুরের আঁচড় লক্ষ্য করলেন এবার অনুপমবাবু।

জবাবের অপেক্ষা না করে সঞ্জয় বোস গাড়ি চালাতে চালাতে মুরুব্বীর সুরে বলল, খুব জরালো একটা কিছু লিখুন দেখি মশাই, লিখে লিখে আমাদের এই নেতাদের মুখোশগুলো ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে পারেন না? আমরা যেটুকু পারি, আপনারা তো তাও পারেন না দেখি—

হাসতেই চেষ্টা করছেন অনুপমবাবু, কিন্তু হাসতে কষ্ট হচ্ছে। ওদিকে তার পাশের মহিলা উৎসুক হয়ে উঠেছে। তার আঙুলের খোঁচা খেয়ে কিনা অনুপমবাবু লক্ষ্য করেন নি, সঞ্জয় বোস ঘাড়

ফেরাল একবার, তারপর সপ্রতিভ মুখে ত্রুটি সারল, ও, পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি লেখক অনুপম চক্রবর্তী, নিজের যখন লেখক হবার স্বপ্ন ছিল, এঁর সাগরেদি করেছি—

হালকা হাসির মধ্যে পরিচয়ের খেই হারাল, তৎপর হাতে সামনের দোতলা বাসটাকে ওভারটেক করছে। মহিলা আরো একটু ঘুরে বসল, মিষ্টি মুখে আরো একটু হাসি ফুটিয়ে দু'হাত জুড়ে নমস্কার জানাল। কিন্তু অনুপমবাবুর মনে হল, আরো কোন নামী লেখকের নাম শুনবে আশা করেছিল মেয়েটি। কষ্ট করে হাসতে হচ্ছে, চালাকের উদ্দেশে বললেন, এঁর পরিচয় দিলেন না তো···শ্রীমতী ?

মেয়েটির দুই গালে লালের ছোপ। ওদিকে সঞ্জয় বোস জোরেই হেসে উঠেছে। উৎফুল্ল মুখেই একবার আড় চোখে চেয়ে নিয়ে জবাব দিল, শ্রীমতী বটে, তবে আমার নয়।···এঁর নাম মিতা মুখার্জী, আমার পড়শিনী, রাইটার্স-এ চাকরির ইণ্টারভিউ ছিল একটা, দিইয়ে এলাম, আর কমিটির জাঁদরেল চেয়ারম্যানটিকে চুপিচুপি শাসিয়ে এলাম, চাকরি না হলে কলমের খোঁচায় চোখে সর্ষে ফুল দেখতে হবে —এটা মশাই জোর জুলুমের যুগ, বুঝলেন !

জোর জুলুমের ক্ষমতা রাখে সেই আত্মপ্রসাদে হাসতে লাগল। মেয়েটির মিষ্টি হাসি মুখে ঈষৎ অপ্রতিভ ভাব। সামনের দিকে মুখ করে বসল।

বুকের ভিতরটা আচমকা ধড়ফড় করে উঠল কেমন অনুপম বাবুর। না, কিছু না, তিনি রোগগ্রস্ত, মাথার ঠিক নেই, নইলে সব দিকের সব কিছু ঠিক আছে।···আসার সময়ে শ্রীলেখাকে টেলিফোনে বলে আসতে পারেন নি, টিফিনে গেছিল। ওদের নারায়ণ সাহেবও টিফিনে গেছিল। নিজের ওপরেই রেগে উঠলেন হঠাৎ, টিফিনের সময় সব টিফিনে যাবে নাতো কি করবে ?

আবার পথ।

অনুপম চক্রবর্তী অনির্দিষ্টের মত হাঁটছেন, হেঁটেই চলেছেন।

এক জায়গায় এসে পা দুটো টান ধরেছে তখন। সামনেব আকাশেরও আলো ফুরানো শ্রান্ত চেহারা। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বিশাল ফটকেব সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। কি কাণ্ড, কতক্ষণ ধরে কত পথ হেঁটেছেন। এখানে এলে মন্দিরের থেকেও গঙ্গার ধারটা ভাল লাগে। ভিতবে ঢুকে পড়লেন। কিন্তু গঙ্গার ধারে বেড়ানো হল না। কাতারে কাতাবে মেয়ে পুরুষ শালপাতার মিষ্টির ঠোঙা হাতে মন্দিবে ঢুকছে। তাদের মুখগুলো লক্ষ্য করেছেন অনুপম বাবু। বিপোর্টাব সঞ্জয় বোস বলছিল, জোব জুলুমের যুগ এটা, যা চাই সেটা জোব কবে আদায় করে নিতে হয়। কিন্তু কারো মুখে এতটুকু জোরের লক্ষণ দেখছেন না অনুপম বাবু, এ-রকম ভীতু ভীতু সমর্পণের মুখ করে এরা কি আদায় করতে চলেছে ?

দেখতে চললেন কি। বাঁধানো চাতালের ওধারে মায়ের মন্দিরের দরজার সামনে মেয়ে পুরুষের রীতিমত ভিড়। সেই ভীড় পিছনের নাট মন্দিরের কাছে এসে ঠেকেছে। অনুপমবাবু সকলের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। নির্নিমেষে দেখছেন। প্রতিমা নয়, এখান থেকে প্রতিমা দেখা যায় না। এই ভিড়ের মুখগুলোই দেখছেন তিনি। যত দেখছেন, চোখের ওপর থেকে যেন একটা পরদা সরে যাচ্ছে তাঁর। এরা সব কি সমর্পণ করছে, কি জমা দিচ্ছে ? ভাবনা চিন্তা সমর্পণ করছে, দুঃখ জমা দিচ্ছে। আর এই করে সঞ্চয়ের ঝুলিতে নির্ভরতা ভরাট করে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু একজনও কি তা পারছে। মুখগুলো আঁতিপাতি করে খুঁজছেন অনুপমবাবু।

বেশীক্ষণ থাকতে পাবলেন না, বেরিয়ে এলেন। তাঁর রাগ হচ্ছে

আর ভিতরে ভিতরে যন্ত্রণা হচ্ছে একটা। তিনি যেন ভিক্ষে চাওয়ার উৎসব দেখে এলেন একটা। মায়ের কাছে কেউ আব্দার করছে না, কেউ দাবি করছে না, সবাই ভিক্ষে চাইছে।...'মা বলে কি কেউ কোথাও আছ ? কোথাও কোন শক্তি কাজ করছ ? যদি থাক তো শুনে রাখ, কাতারে কাতারে তোমার এই ভিখিরি সন্তান দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমার মা একদিন ছেলে ভিক্ষে চেয়েছিল, এই আমাকেই—আমার সাধ্য থাকলে ঠিক তেমনি করেই তোমাকে দিয়েও ছেলে-ভিক্ষে করতাম।

মন্দির চত্বর থেকে উর্ধ্বশ্বাসে বেবিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু পাবা যাচ্ছে না, ভিখিবিব দল ছেকে ধবেছে—না, মুখোশ-পরা ভিখিরি নয়, এক নজর তাকালেই যাদের চেনা যায়, সঙ্গ পরিহার করে চলতে ইচ্ছে যায়।

লোকগুলো কি দেখে কি বুছে অনুপমবাবুকে ওভাবে ছেঁকে ধরল কে জানে। পয়সার বায়না ধরে সঙ্গে সঙ্গে আসতেই থাকল তারা। পকেটে যা ছিল খুচরো পরসা আর তিন-চারটে টাকা সব ওদের জন্য ফেলে দিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচতে চাইলেন অনুপমবাবু।

পথ চলেছেন তো চলেছেন। রাস্তার অনেক জায়গায় অন্ধকার, ফলে মাঝে মাঝে ইটে-পাথরে ঠোক্কর খাচ্ছেন। মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করছে, পা দুটো টলছে।...রাস্তা এরই মধ্যে নির্জন কেন এত...রাত কত এখন ?

সন্ত্রাসে লাফিয়েই উঠলেন হঠাৎ। কান-ফাটানো দমাদম বোমার শব্দ গোটাকতক। সামনে কতকগুলো আবছা মূর্তির হৈ-হৈ, ত্রস্ত ছোটাছুটি। বড় রাস্তার ওপর দিয়ে তীরের মত ট্রাক বেরিয়ে গেল একটা। মনে হল পুলিসের গাড়ি। সেটা লক্ষ্য করেই আশপাশের গলি থেকে বোমা ছোঁড়া হয়ে থাকতে পারে, সামনের ওই লোক-

গুলোও তো বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে পালাল—ওরা কে তাহলে ? স্নায়ু একটু বশে আসতে অনুপম বাবুর মনে হল, দলগত সংঘর্ষ কিছু। একদল আক্রমণ করতে এসেছিল, আর একদল অন্ধকারে গলির মুখে মুখে তার জবাব দেবার জন্য ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ পুলিশের ট্রাক এসে যাবার ফলেই সম্ভবত এই ছোটাছুটি এধার ওধার থেকে একটা দুটো বোমার আওয়াজ আসছেই তখনো।

…প্রকাশক জীবন ঘোষ তাঁর লেখা বাতিল করে দিয়ে একটুও কি অন্যায় করেছেন ? ও লেখার মধ্যে অন্ধ আক্রোশে নীতি-দুর্নীতি নিয়ে তিনি গল্পের কাঠামো বিস্তার করেছেন, কফিখানা ছেড়ে এই জীবন আর এই যৌবনের ছোঁয়াও কি কোথাও দিতে পেরেছেন ? এদেরই কি তিনি চেনেন ? আসলে কাউকেই চেনেন না, অন্ধের মত জীবন-রচনার নেশায় মেতেছিলেন। জীবন ঘোষ, তুমি সত্যিই বড় উপকার করেছ আমার।

আচমকা একাধিক হাতের এক হ্যাঁচকা টানে বড় রাস্তা ছোঁয়া একটা অন্ধকার গলির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বাঁচলেন তিনি। না, নিজের কেরামতিতে নয়, যারা টেনে এনেছে তারাই পড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আবছা অন্ধকার ভেদ করে চোখ টান করে দেখলেন অনুপমবাবু। পাঁচটি অল্পবয়সী ছেলে—কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে বয়েস, তাদের তিনজন তাকে ধরে আছে। একজন শক্ত মুঠিতে তাঁর বুকের জামাটা ধরেছে, আর দুজন দুদিক থেকে। বাকি দু'জনের একজনের হাতে পাইপ গান, অন্য জনের হাতে খোলা ছোরা।

যারা ধরে আছে তাদের একজন ঝাঁকুনি দিয়ে তাঁকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে বলে উঠল, কে বাবা তুমি রাত করে এই নো

ম্যানস ল্যাণ্ডে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ—কি মতলব ?

জবাব না দিয়ে অনুপম চক্রবর্তী ফ্যালফ্যাল করে আবছা আঁধার-ছাওয়া মুখগুলো দেখছেন। ওদিকে যারা টেনে এনেছে তাঁকে তারাও যেন লোকটাব বয়েস ঠাওর কবে আশানুরূপ উত্তেজিত হয়ে উঠতে পাবল না। তবু ছোরা হাতে লোকটা চটপট তাঁর জামাব পকেট আর কোমরের চাবদিক পবীক্ষা কবে মন্তব্য করল, গড়ের মাঠ, কোন দেশের লোক মনে হচ্ছে না—

সঙ্গে সঙ্গে আব একজনেব সন্দিগ্ধ গলা, টিকটিকি নয় তো বে··· সেই এক শালা টিকটিকিই তো ভুলিয়ে ভালিয়ে ভুপালকে ফাঁসিয়েছে —অন্ধকারে বোমাবাজীর মধ্যে দিব্বি হেঁটে চলেছে কোন্ সাহসে !

তক্ষুণি জোড়া জোড়া চোখগুলো তাঁব মুখেব ওপরে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পাইপ গান হাতে ছেলেটা আবো একটু সামনে ঝুঁকল। কে আপনি ?

একটা মানুষ।

তিবিক্ষি মেজাজে আব একজন বলে উঠল, সন্দেহ যখন হয়েছে একবারে শেষ করে দে—কেমন দার্শনিকের মত জবাব দিচ্ছে দেখছিস না।

পাইপ গান হাতে ছেলেটাই বোধ হয় পাণ্ডা! পরামর্শে কান না দিয়ে কঠিন মুখে জেরা শুরু করল—কি নাম ?

অনুপম চক্রবর্তী।

থাকা হয় কোথায় ?

অনুপম বাবু ঠিকানা বললেন, কিন্তু ভায়ের নাম উল্লেখ করলেন না। ওই নাম বললে ওদের বিশ্বাস পাকাপোক্ত হবে সে বিবেচনা আছে।

কিন্তু সে তো দক্ষিণ কোলকাতায়, পকেটে পয়সা নেই, এত পথ

আপনি হেঁটে যাচ্ছেন ?

চালাকি, চালাকি বুঝছিস না ! আর কথা না বাড়িয়ে খতম করে দে !

পাশের এই অসহিষ্ণু ছেলেটার দিকে তাকালেন অনুপমবাবু। ওর চোখে ঘৃণা-ভরা ঘাতকের দৃষ্টি। হাতের ঝকঝকে ছোরাটা দেখে সর্বাঙ্গ থেকে যেন পা বেয়ে রক্ত নেমে যাছে। বললেন, এসেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে, সেখানে ভিখিরিরা এমন ছেঁকে ধরেছিল যে পকেটে যা ছিল সব গেছে।

ওঃ: দয়ার অবতার হর্ষবর্ধন একেবারে—সব দিয়ে একবস্ত্রে বাড়ি ফেরা হচ্ছে ! ছোরা হাতে অসহিষ্ণু ছেলেটার মন্তব্য।—কি কচকচ করছিস, কে আবার এসে পড়বে, দে না শেষ করে !

কিন্তু পাইপ গান হাতে ছেলেটার দু'চোখ তাঁর মুখের ওপর থমকে আছে।

কি নাম বললেন ?

অনুপম চক্রবর্তী।

বাড়ির ঠিকানা কি বললেন ?

যাচাইয়ের সঠিক জবাবই দিলেন অনুপম বাবু।

কি করা হয় ?

এতদিন তো লোকে লেখক বলত।

সব ক'জোড়া চোখই মুখের ওপর আবার নতুন করে থমকালে গেল। ওদের মধ্যে জনা-তিনেকের কাছে অন্তত নামটা বিশেষ পরিচিত। একজন সকলের উদ্দেশ্যেই যেন বলল, লেখক অনুপম চক্রবর্তী—নামটা তো শোনাই—বছর কয়েক আগে কি একটা গল্প সিনেমাতে খুব নাম করেছিল না ?

মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে গল্পের নাম বললেন অনুপম বাবু।

ক্রূর নির্মম চাউনিগুলো যেন নরম হতে লাগল। পাইপ গান হাতে দলের পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করল, এতদিন লোকে লেখক বলতে মানে? এখন কি বলে। হাসতে চেষ্টা করে বিড়বিড় করে জবাব দিলেন, পাগল-টাগল বলে হয়তো।

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। একজন আর একজনের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করল, ঠিকই বলে মনে হচ্ছে।

দলের পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করল, এতটা পথ আপনি যাবেন কি করে, হেঁটে?

অনুপম বাবু জবাব দিলেন, তোমরা ছেড়ে দিলেই যাব।

এই, তোদের কারো কাছে পয়সা আছে?

যে ছেলেটা তিনবার করে ছোরা উঁচিয়ে তাঁকে খতম করে দেওয়ার কথা বলেছে পকেট হাঁতড়ে সে-ই একটা সিকি বার করে তাঁর হাতে দিল।—নিন্ মশাই, ওই ওদিক থেকে একটা বাস ধরে যদ্দুর যেতে পারেন চলে যান—আর এভাবে হাওয়া খেয়ে বেড়াবেন না। যান, চটপট চলে যান—

অনুপম বাবু আবার পথ চলেছেন। চলার গতি বেশ দ্রুত এবার। মাথাটার মধ্যে কি হচ্ছে বুঝতে পারছেন না, যেন অনেক-গুলো শব্দ তাঁর মাথাকে ভরাট করে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। সিকিটা হাতেই রয়েছে, নিজের অগোচরে আঙুলে করে ঘষছেন সেটা।… ওরা মানুষ মারে, কাউকে শত্রু মনে হলেই তার রক্তে হাত ভেজায়। অথচ ওদেরও বুকের কোথাও দয়ামায়ার ছিটেফোঁটা নেই এ কে বলবে? ওই সকলের থেকে হিংস্র ছেলেটাই তো তার সম্বল এই সিকিটা হাতে গুঁজে দিল!—তাহলে? তাহলে জীবন ঘোষের কথাই ঠিক। লেখক অনুপম চক্রবর্তী এ-যুগে অচল, তাঁর হাতে যুগের আয়না নেই।

যাঃ। সিকিটা হাত থেকে পড়ে গেল কোথায়। অন্ধকার ভেদ করে এদিক-ওদিক বার কয়েক খুঁজলেন ওটা। যাক। হাসতে লাগলেন, লেখার মতই ব্যাপার বটে। নিজের উদ্দেশ্যে চোখ পাকালেন, আবার লেখার চিন্তা! ভিখিরি কোথাকার—

দ্রুত পা চালালেন। সর্বাঙ্গ হঠাৎ সিরসির করে উঠল আবার। কাঁধে পিঠে ছোরার স্পর্শ, বুকে পাইপ গানের, না তাঁর নয়, আর কারো একটা বিপদের ছায়া যেন স্পর্শ হয়ে তাকে ছেকে ধরেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফেরা দরকার তাঁর, এক্ষুণি, বাড়ি গিয়ে অজুকে না দেখা পর্যন্ত এই হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি থামবে না।

…বাড়িতে পা দিলেন যখন, রাত দশটা বেজে গেছে। এত পথ হাঁটার ক্লান্তিতে হাত পা দুটো আব নড়তে চাইছে না, অথচ অনুপম বাবুর একটুও কষ্ট হচ্ছে না। নীচেই দাঁড়িয়ে সব। অজু, তার সামনে দুজন পুলিস অফিসার, দুটো সিপাই, শুক্লা, শ্রীলেখা—

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দাদার হাত ধরল অজিতেশ। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসার অবকাশ মিলল না। অনুপম বাবু দু'হাত তার ওই হাতখানা চেপে ধরলেন একবাব। তাবপর তার বুকে মুখে হাত বোলালেন একবার। অস্ফুট স্বরে বললেন, অজু, তুই খুব সাবধানে চলাফেরা করিস তো?

গম্ভীর মুখে দাদাকে দু'এক মুহূর্তে দেখল অজিতেশ। মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, চল, ওপরে চল—

দাদাকে এক রকম বাহুবেষ্টন করেই ওপরে তার ঘরে নিয়ে এল। বৌদির দিকে চেয়ে বলল, আজ আর কোন কথা নয়, মুখ-হাত ধুইয়ে খেতে দাও, তারপর সোজা বিছানায়—

শ্রীলেখা চুপচাপ দাঁড়িয়ে মানুষটাকে নিরীক্ষণ করছিল। দু'চোখ

বোঁজা সেই থেকে। চিন্তার জালে জড়িয়ে গেছে বোঝা যায়। এ-রকম প্রায়ই হয়।···শুকনো মুখ, গালের ওপর হাড় দুটো উঁচিয়ে আছে। একটা নীরব যন্ত্রণা ওই মুখে ক্রমেই যেন এঁটে বসেছে।

এমনি চুপ মেরে থাকলেই শ্রীলেখার আরো যেন বেশি ভয় ধরে। সামনে ঝুঁকে কাঁধটা নেড়ে দিল।—কি ভাবছ?

অনুপম বাবু চোখ মেলে তাকালেন। বিগত দিনটা থেকে আজকের এই বর্তমানে পৌঁছুতে সময় লাগছে একটু। জবাব না দিয়ে চেয়েই রইলেন।

শ্রীলেখা আবার জিজ্ঞাসা কবল, কে বদলাচ্ছে বলছিলে? কাল কলেজ স্ট্রীটের পাবলিশার কি বলেছে, কি করেছে?

আমার লেখা বাতিল করেছে। উচিত কাজই করেছে, কিন্তু তার ব্যবহার আগের থেকে একেবারে বদলে গেছে। অসংলগ্ন সুরে অনুপম বাবু বলে গেলেন, বড় বকমের একটা কিছু গলদের ফসল ফলছে···বুঝলে···সক্কলে বদলে যাচ্ছে···অজুটাও আজ আমাকে মুখের ওপর বলে গেল, ওদের কথামত না চললে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে—

তোমার ভালর জন্যেই বলেছে।

মুখখানা প্রায় বিকৃত করে হাসতে চেষ্টা করলেন অনুপম বাবু।—আমার ভালর জন্যেই তো··আমার ভালর জন্যে ভবিষ্যতের ঢের বেশী বলবে তুমি দেখে নিও, এই তো সবে শুরু। চোখ টান করে মুখের দিকে তাকালেন।—তুমি বদলাচ্ছ না? একটু আগেই তো তুমি মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, তোমার খুশি আপিসে যাবে না, আমার তাতে কি—

গা ঘেঁসে পাশে বসল শ্রীলেখা। আদরে সুরে বলল, বলব

নাতো কি, তুমি আমার কোন কথা শোন, কাউকে কিছু না বলে কালকে দুপুরে বাড়ি থেকে বেরুলে, ফিরলে রাত দশটার পর—

ক্লান্ত মুখে অনুপম বাবু জবাব দিলেন, কাকে বলব, শুক্লাটা দিনে দুপুরে ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমোয়···তোমাকে দু'বার টেলিফোন করলাম···টিফিনে গেছ···তোমাব বড় সাহেবও টিফিনে গেছে···

অনুপম বাবুর চোখ অন্য দিকে, শ্রীলেখার দৃষ্টিটা তাঁর মুখের ওপর থমকে রইল কয়েক মুহূর্ত। মাঝে মাঝে তার কেমন মনে হয়, এই লোকের একটা ষষ্ঠ চেতনা যেন প্রখর হয়ে উঠছে।

গতকাল সামনে বসিয়ে একগাদা নোট লিখিয়েছিল নারায়ণ সাহেব, তারপর সদয় হয়ে শ্রীলেখাকে আর তার সেক্রেটারী মিসেস আয়েঙ্গারকে লাঞ্চের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। লোকটা দিলদরিয়া মেজাজের, এ-রকম আমন্ত্রণ মাঝে মাঝে আসে। শরীর অসুস্থ জানিয়ে শ্রীলেখা পাশ কাটিয়েছে, আয়েঙ্গার গেছে। সেই মেয়ে আবার সাহেবের সঙ্গে লাঞ্চ করতে পেলে খুশি।

তুমি তাঁকে ফোন করেছিলে নাকি?

অনুপম বাবু তার দিকে ফিরলেন, চাউনিতে ঈষৎ কৌতুক ঝরল এবার। জবাব দিলেন না।

চেষ্টা সত্ত্বেও একটা উদগত বিরক্তি ঠিক-মত চাপতে পারল না শ্রীলেখা।—তুমি কি যে ভাব বুঝি না, কেমন টিফিন করতে গিয়েছিলাম শুনবে? মাথা ধরেছিল, তাই মেয়েদের টিফিন ঘরে গিয়ে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে বেঞ্চিতে মাথা রেখে চুপচাপ এক ঘণ্টা শুয়ে ছিলাম—

কৌতুক গিয়ে দু'চোখে বেদনার ছায়া নিবিড় হতে থাকল

অনুপম বাবুর। একটা হাত উঠে তার গায়ে-পিঠে বিচরণ করতে থাকল। অস্ফুট স্বরে বললেন, এ-রকম কেন কর···খাও না কেন··· লেখা, আমার ভিতরে সর্বদা কি যে একটা যন্ত্রণা ··ওরা এটা পাগলামি ভাবে···তুমি ভেব না···তুমি বদলে যেও না, ঠিক আগের মত থাক।

॥ তিন ॥

অনুপম বাবুর বায়স এখন উনচল্লিশ।

তাঁর বুকের তলার নীরব যন্ত্রণার সূত্রপাত আজ থেকে বাইশ বছর আগে, বয়েস যখন মাত্র সতের। ছেলেবেলা থেকে তার অভিমান বেশি, ক্ষোভও বেশি, গোঁ বেশি। কারো সঙ্গে বেশি মিশতে পারতেন না, মতের অমিল হলে রেগে যেতেন, কিন্তু ঝগড়া-ঝাঁটি করে সেই রাগ প্রকাশ করতে পারতেন না। ভিতরে ভিতরে গুমরোতেন শুধু। তারও বছর তিনেক আগে থেকে অর্থাৎ বছর চৌদ্দ বয়েস থেকেই কবিতা লেখা শুরু হয়েছিল। ছোট ছোট

খাতা কবিতায় ভরাট হয়ে উঠত। তার থেকেই তুই একটা করে বেছে ছোটদের কাগজে পাঠিয়ে দিতেন। ছাপা হলে যেমন খুশি, কবিতা ফেরত এলে আবার তেমনি অভিমান। কোনভাবে কেউ তাকে বাতিল করবে এ ছেলেবেলা থেকে ববদাস্ত কবা কঠিন হত।

কথা এমনিতে কম বলতেন। এদিক থেকে মায়ের স্বভাব পেয়েছিলেন। সেই মহিলা আবার এত কম কথা বলতেন যে এই ছেলের কাছেও সেটা এক ধরণেব বিস্ময়ের ব্যাপাব। সমস্ত দিন নিঃশব্দে কাজ করেই চলেছেন, কিন্তু মুখে রা নেই। অবুঝেব মত বাবাকে এক সময় রাগাবাগি করতে দেখলেও মা বড় একটা জবাব দিতেন না, বেশি অসহ্য হলে বাবাব মুখের দিকে চুপচাপ চেয়ে থাকতেন। বরাবরই মা এই রকম ছিলেন কিনা ছেলের তাতে সন্দেহ ছিল। তারও কারণ আছে। মা ছিলেন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, বিয়ের আগে পর্যন্ত কলেজে পড়েছেন। মায়ের বড় তু'বোনের মোটামুটি রূপ ছিল, দাতুব পয়সার জোরে তাঁদের বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। ভাই বোনের মধ্যে মা-ই সব থেকে ছোট, তাঁর বিয়ে দিতে দাতুর নাকি হিমসিম অবস্থা। মায়ের গায়ের রং কালো, দেখতেও তেমন সুশ্রী নয় (অনুপম বাবুর চোখে অবশ্য মায়ের থেকে বেশি সুন্দর আর কেউ নয়) মায়ের বিয়ে আর হয়ই না। শেষে অবস্থার দিকে না তাকিয়েই বাবার সঙ্গে মায়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাবা তখন কলেজের মাস্টার, আর দেখতে দাতুর অন্য তুই জামাইয়ের থেকে ঢের ভাল—অবস্থা সে-রকম ভাল না তাতে কি ? তাছাড়া অবস্থাই বা কি এমন খারাপ, কলেজে পড়ান, তুটো টিউশনি করেও ভাল রোজগার করেন।

কিন্তু বাবা মানুষটা আবার কোন গোছের গোঁয়ার আগে জানলে এই লোকের কাছে দাতু মেয়ে দিতেন কিনা সন্দেহ। মায়ের অন্য

দুই বোন বড় ঘরে পড়েছে তাই তাঁদের সঙ্গে বেশি মাখামাখিতে বাবার আপত্তি। মামাবাড়ির অবস্থা ভাল, তাই তাঁদের আচরণের ত্রুটির প্রতি বাবার বিশেষ লক্ষ্য। বেশি করলেও মান খোয়া গেল, কম করলেও। বেশি করলে দাক্ষিণ্য ভাবেন, কম করলে অবজ্ঞা।

এই পবিমিত আয়ের মধ্যেও মোটামুটি ভালই চলে যাচ্ছিল।··· প্রথম দুর্দিন বড় আচমকা উপস্থিত। দুর্দিনে পড়াব হেতু বাবাব মেজাজ। (বাবার এই মেজাজটিও যে অনুপম বাবু ষোল আনাই পেয়েছেন সেটা নিজেব অবশ্য কখনো মনে হয়নি। বাবার মেজাজ চৌচির হয়ে ফেটে পড়ত, তাঁরটা চাপা থাকে– এইকুটুই তফাত)। ···যে কলেজে বাবা চাকরি কবতেন তাব সর্বেসর্বা ভদ্রলোকটি মালিকানার সূত্রে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—ছাত্র পড়ানোর বিদ্যে তাঁর ছিল না। এই দুর্বলতাটুকু তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনেব কড়া শাসনে ঢেকে রাখতেন। তাঁর সঙ্গেই কি নিয়ে বাবার ফাটাফাটি হয়ে গেল একদিন, মুখের ওপর যা তা বলে দিয়ে বাবা চাকরি ছাড়লেন।

চাকরির বাজার দস্তুরমত খারাপ সেই সময় থেকেই, বি-এ, এম-এ, পাশ করে কত লোক বসে আছে, যা পাচ্ছে তাই আঁকড়ে ধরছে। অনেক চেষ্টা করেও বাবা কলকাতার কোন কলেজে চাকরি জোটাতে পারলেন না। পুবনো টিউশনি শেষ হচ্ছে নতুন ছাত্রও যোগাড় করা গেল না। কলেজের সঙ্গে যোগ না থাকলে কলেজের ছেলে আসবে কেন?

এই যখন অবস্থা, অনুপম চক্রবর্তীর বয়েস তখন মাত্র দশ, অজুর চার আর অমু সবে হয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে সব মিলিয়ে প্রায় বছর চাবেক জলপাইগুড়ির মামাবাড়িতে কেটেছে অনুপম চক্রবর্তীর। তার প্রধান কাবণ বড় মামীব তাঁব ওপব অন্ধ আকর্ষণ।

জলপাইগুড়িব নামকরা কনট্রাক্টর ছিলেন দাছু, বড় মামা তাঁব জায়গা নিয়েছে—মামাদের মধ্যে তাঁবই মোটামুটি বড অবস্থা। পব পর ছুই মেয়ের পর অনেকদিন বাদে এক মাসের মধ্যে একই বাড়িতে বড় মামাব একটি ছেলে আব অনুপম চক্রবর্তীব জন্ম। মামাব ছেলেটা এক মাস আগে জন্মেছিল, আব জন্মেব কয়েক ঘণ্টাব মধ্যে চলেও গেছে। বড় মামীব একটা ছেলেব বড় সাধ ছিল, তাই কয়েক ঘণ্টাব সেই ছেলেব শোক ভুলতে পারেন নি।

···অনেকখানি ভুলেছিলেন অনুপম ভূমিষ্ঠ হবাব পব। কি এক অস্থুখে মায়েব আবাব তখন যায যায অবস্থা। সদ্য ভূমিষ্ঠ সেই ছেলেকে তখন বড়মামী বুকে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর তখন কি রকম মাথায় ঢুকেছিল, তাঁব সেই মবা ছেলেটাই ফিরে এসেছে। কয়েক ঘণ্টার সেই শিশুব আদল নাকি হুবহু দেখতেন এই ছেলের মুখে, এই সবই পরে মামীর মুখে শোনা। এমন কি মায়ের বিয়ের আগে থেকে শুরু করে পরের বহু ঘটনাও এই বড়মামীর মুখ থেকেই শোনা।

জন্মের পর মায়ের শরীর ফিরতে দেড় বছর লেগেছিল নাকি। টানা সেই দেড় বছর মা জলপাইগুড়িতে দাছুর কাছে ছিলেন। শেষের দিকে বাবা অনেকবাব মাকে নিতে এসেছিলেন, দাছু দিদিমা দেননি—বাবা রাগ করে ফিরে গেছেন।···দেড়টা বছর সেই শিশু বড়মামীর কাছে থেকে, তাঁর বুকের ছুধ খেয়ে প্রাণে বেঁচেছিল। দেড় বছর বাদে বাবা যখন মাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন, তখন বড়মামী নাকি একেবারে অবুঝ পাগলের মত কান্নাকাটি।

দেড় বছরের শিশুরও একটা মানসিক অভ্যস্ততার দিক আছে। টানা দেড় বছর যাকে মা বলে অনুভব করেছে, সেখান থেকে হঠাৎ তাকে ছিঁড়ে আনতে গেলে বাধা অস্বাভাবিক নয়। কান্নাকাটি করে

সেই শিশু এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে একমাসের মধ্যে মা আবার এসে তাকে মামীর কাছে রেখে যেতে বাধ্য হন। তারই ফলে মামীর আরো বদ্ধ ধারণা তাঁর মৃত সন্তান অন্য ঘরে ফিরে এসেছে। এরপর থেকে দশ বছর পর্যন্ত বহুবার সেই ছেলে নিয়ে মামীকে কলকাতায় বাবার কাছে থাকতে হয়েছে, নয়তো মা গিয়ে থেকেছেন জলপাই-গুড়িতে মামীর কাছে।

ছ'বছর বয়সে অজু আসার পর থেকেই মামীর বায়না, এ ছেলেটাকে আমায় দিয়ে দাও। মায়ের মন সরেনি, আর বাবাও নাকি ও কথা শুনলে রেগে যেতেন। দশ বছর বয়সে অজুর পর অমু আসতে বড়মামীর তাগিদ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মাকে বলতেন, তোমার তো দুটো থাকল, বড় ছেলেটাকে আমায় দাও। আনুষ্ঠানিক ভাবে তাকে দত্তক নেবার আগ্রহে মামাকে অস্থির করে ছেড়েছিলেন তিনি। বড়মামাও শেষে মাকে অনুরোধ করেছিলেন, দিয়েই দে না ছেলেটাকে।

ঠিক সেই সময়ে বাবার কর্মজীবনে ওই বিভ্রাট। কলেজের চাকরি ছাড়ার ফলে নতুন চাকরি জুটছে না, সংসারের অচল অবস্থা হয়ে আসছে। বড় মামা আর মামীর আশা হয়েছিল এই কারণেই ছেলের বাবার আর বিশেষ আপত্তি হবে না, বরং ওই অবস্থায় এক ছেলের দায়িত্ব শেষ হল বলে উল্টে হয়তো স্বস্তি বোধ করবেন। কিন্তু বাবাকে তখনো চিনতে বাকি ছিল তাঁদের। চাকরি বাকরি থাকলে যদি বা বাবার মেজাজ ঠাণ্ডা থাকত, না থাকার ফলে উল্টো হল। মামা মামীর এবারের এত আগ্রহ সন্দেহের চোখে দেখলেন। করুণা ভাবলেন! সাফ জবাব দিলেন, গরিবের ছেলে গরিবের কাছে থাকুক, কারো করুণায় কাজ নেই।

এই ছেলে নিয়ে বাবা-মা আর মামা-মামীর মধ্যে ছোটা-খাট

একটা মনোমালিন্য ঘটে গেল। ওদিকে বাবাকে কলকাতা ছাড়তে হল। অনেক চেষ্টার পর দূরের এক মফঃস্বল কলেজে চাকরি জুটল। মা ছেলেদের নিয়ে এসে সেইখানে নতুন করে সংসার পেতে বসলেন।

…সেই ছেলেবেলার কথা মনে আছে অনুপম বাবুর। স্কুলে পড়তেন, নিজের মনে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু কিছুই ভাল লাগত না। বাড়ি না, স্কুল না—বাতাস সাঁতরে জলপাইগুড়ি চলে যেতে ইচ্ছে করত। কারণে অকারণে বাবার রাগারাগি দেখে আরও খারাপ লাগত। বাবা যত বেশি রাগতেন, মা তত বেশি চুপ। দশ বছরের ছেলেটার দুইই অসহ্য লাগত। তবু বছর ছয়েক একভাবে কেটে গেছিল। রোজগার বাড়াবার চেষ্টায় বাবা দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন। সকালে রাত্রে দুটো করে টিউশনি করতেন। মফঃস্বল শহরে ছাত্র পড়ানোর রোজগার কলকাতার অর্ধেক। তার একটি পয়সা পর্যন্ত সঞ্চয় করতেন। কলেজের মাস মাইনের থেকেও টাকা বাঁচাতে চেষ্টা করতেন। এই করে সস্তায় ছোট একটু জমি কিনলেন আর যে করে হোক সাদা-মাঠা গোছের দু'খানা ঘর তোলার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

সেই সময় আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতই আবার এক দুর্ঘটনা।

ঘর দুটোতে সবে তখন চূণকাম শুরু হয়েছে, আর ক'টা দিন বাদেই এখানে উঠে আসার কথা। সকলের এমন কি মায়ের মুখেও তখন একটু আনন্দ দেখেছিলেন অনুপম চক্রবর্তী। সেই আনন্দ চুরমার হয়ে গেল।…সন্ধ্যায় ছাত্রের বাড়ি থেকে অজ্ঞান অবস্থায় বাবাকে বাড়ি নিয়ে আসা হল। সেখান থেকে ডাক্তারের নির্দেশে হাসপাতালে। পরদিন বাবার জ্ঞান ফিরল বটে, কিন্তু দেহ বিকল—শরীরের একদিকে পক্ষাঘাত। প্রাণে বাঁচলেন। ডাক্তারের মন্তব্য,

বেঁচে গেছেন এটাই আশ্চর্য।

···হ্যাঁ, সেই নতুন ঘরেই উঠে এসেছিলেন তাঁরা। নিজেদের ঘরে। মাসখানেক আরো দেরি হয়েছিল, এই যা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সর্বস্বান্ত যেন সকলেই। শিশু তিনটে পর্যন্ত। না, অনুপম বাবুকে তখন শিশু বলবে কে, ষোল বছর বয়েস, য়ুনিভার্সিটিতে প্রথম পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন সেবারই। বয়সের তুলনায় অনুভূতি একটু বেশিমাত্রায় প্রখর। মা একদিন শুধু তাঁকে বলেছিলেন, কি হবে রে এখন, কি করব আমরা ?

সেই কথাগুলো এখনো যেন অনুপম বাবুর হাড়ে-পাঁজরে লেগে আছে।

···দিনের চাকা থেমে থাকেনি তবু, উনিশ-বিশ এক-রকমই ঘুরছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বড় মামা আর বড় মামী জলপাইগুড়ি থেকে ছুটে এসেছেন। এই ছ'বছরে অনুপম চক্রবর্তীর প্রতি মামীর টান বেড়েছে বই কমেনি। বছরের বড় ছুটির আগে প্রতিবারেই তাঁর নামে টাকা পাঠিয়েছেন। বছরে ওই একবার করে তাঁকে জলপাইগুড়ি যেতে হয়েছে। বাবার তাতেও আপত্তি ছিল, কিন্তু এ আপত্তি টেঁকেনি। প্রতিবারই আসার সময় মামীর সেই কান্নাকাটি, কিছুতে ওরা তোকে দিলে না, এখন তো বড় হয়েছিস, তোর বাবাকে বলতে পারিস না—মামীর কাছে থাকব !

হ্যাঁ, বয়সের তুলনায় অনুপম বাবু একটু আগেই কেমন করে যেন বড় হয়ে উঠেছিলেন। গত ছ'বছরে গরিব বাবার সংসারে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন। আর সেই সঙ্গে বাবার ওই গোঁ-টাকে সম্মানের চোখেই দেখতে শুরু করেছিলেন। সব থেকে বেশি আশ্চর্য, বয়স যত বাড়ছিল নিজের মা-টিকে তত বেশি ভাল লাগছিল। মা তাঁর কবিতার খাতা দেখতেন, পড়তেন, কিন্তু একটিও মন্তব্য করতেন

না কখনো। একটা নতুন কবিতা লেখা হলে মা কখন পড়বেন সেটা, আশায় মনে মনে উন্মুখ হয়ে থাকতেন। মায়েব জন্যেই যেন· লেখা, মা পড়বেন বলে লেখা। মায়েব সঙ্গে যেন বেশ মজাব গোছের অদৃশ্য একটা একাত্মতা গড়ে উঠছিল তাঁব। নিজে চেষ্টা করবেন কি, মামীর কাছে এলে ক'দিনের মধ্যেই তাঁব মনে হত, কবে ফিরবেন তিনি মা যেন সেই আশায় আব অপেক্ষায় বসে আছেন। শুধু মা কেন, ভাই ছুটোব প্রতিও অদ্ভুত টান তাঁব। অজু তখন দশ বছরেব, আব অমু ছ'বছবের। অজু ছুবন্ত একটু বেশি, কিন্তু দাদাব গলা শুনল তো ঠাণ্ডা। আব অমুটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুবে বেড়াতে কি ভালই না লাগত।

বড় মামা আব মামী এসে যতটা সাধ্য কবলেন। এ-সংসারের সমস্ত দায়িত্বই যেন তখনকাব মত তাঁব কাঁধে তুলে নিলেন। বাবার চিকিৎসাবও ত্রুটি থাকল না। ষোল বছরেব অনুপম চক্রবর্তীর মনে মনে ভয় ছিল, মামা মামীকে খবব দেবাব দরুণ বাবা হয়তো তাঁর ওপব রেগে আগুন হবেন। মামীকে লিখতে মা-ই অবশ্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা হাজার রাগলেও প্রাণ থাকতে ছেলে মায়ের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারবে না জানা কথাই। কিন্তু মামা-মামী চলে আসাতে রাগের বদলে বাবাব ছু'চোখে জল গড়াল। তাঁর ষোল বছরের ছেলে একখানি সতেজ দম্ভের শোচনীয় পরাজয় দেখল। বুকের তলায় সেটাও এক ধরণের ক্ষত সৃষ্টি করল বুঝি।

মাস তিনেকের মধ্যে বাবা বাড়ির মধ্যে টেনে-হিঁচড়ে একটু আধটু চলতে ফিরতে সক্ষম হলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে আর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে মামী গত মাসে সামনেব জমিতে আব একখানা ঘর তুলে দিয়েছেন। বাবা আর একটু সুস্থ হলে সেই ঘরে বসে ছেলে পড়াতে পারবেন। মফঃস্বল শহর, সকলে সকলকে জানে, একটু

চেষ্টা করলেই ছাত্র জুটবে। বাবার কলেজের চাকরি নেই বটে, কিন্তু সহ-অধ্যাপকরা সকলেই সহানুভূতিশীল। বাড়িতে ছেলে পড়ানোর প্রস্তাব এবং ছেলে পাঠানোর ব্যাপাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তাঁরাই দিয়েছিলেন। ষোল বছরের ছেলেটাব চোখের ওপর মামীর সাহায্যে ঘর উঠতে দেখল। কিন্তু তার লক্ষ্যবস্তু ঘর নয়, বাবার মুখখানা। বাবার মুখে নতুন করে একটা বিশীর্ণ আশা বাসা বাঁধছে।

··তারপরে যা, একমাত্র ষোল বছরের ওই ছেলেই বোধকরি মনে মনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল তাব জন্যে। যাবাব আগে বড় মামী সেই পুরনো প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। মিষ্টি করেই বলেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে একটা দাবির সুর যেন স্পষ্ট কানে ঠেকেছিল ছেলেটার।

বড় মামী বলেছিলেন, এবারে অনুপকে আমি নিয়ে যাই, আর তোমরা আপত্তি কোরো না—ওর ভবিষ্যতটা তো দেখতে হবে, ও দাঁড়ালে তোমাদের দুর্ভাবনার শেষ হবে।

দু'চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ষোল বছরের ছেলে সেদিন বাবার মুখখানা দেখছিল, মায়ের মুখখানা দেখছিল। বুকের তলায় একটা নিষ্ঠুর আনন্দ দানা বেঁধে উঠেছিল। কিন্তু আনন্দটা যন্ত্রণার মত। বাবা চুপ, মা চুপ। বড়মামী তার দিকে চেয়ে তাকেই বলেছেন, এবারে তুই আমার সঙ্গে যাবি, বুঝলি? আমার কাছে থাকবি—

মাকে শুনিয়ে, বিশেষ করে বাবাকে শুনিয়ে ষোল বছরের সেই ছেলের বলতে ইচ্ছে করেছিল, কবে যাবে বল, আজ? কাল? তার বদলে ঝাঁঝের সুবে মামীকে বলেছে, কি যে বল ঠিক নেই, দু'মাস বাদে আমাব ফাইন্যাল পবীক্ষা না, এখন আমি ছোটাছুটি করব।

মামী অবাক একটু, ছোটাছুটি করবি কেন, বাড়িতে বসে পড়াশুনা করবি, পরীক্ষার আগে আগে মামার সঙ্গে এসে পরীক্ষা দিয়ে যাবি।

বাজে বোকা না, এখন এই করতে গেলে পরীক্ষায় সোজা ফেল মারব, ক'টা মাস এমনিতেই পড়াশুনা হয়নি।

এখানে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে ছেলেটা সেই দিনই বুঝে নিয়েছিল। মামী জলপাইগুড়ি চলে গেছেন। মাঝে দু'টো মাস মাত্র সময়, পরীক্ষার পর তাকে নড়তে হবে। চাপা আক্রোশে একটা হাস্যকর সঙ্কল্প মাথায় এসেছিল ছেলেটার। পরীক্ষায় ফেল করতে হবে, ফেল করে বাবা মায়ের বুকে আঁচড় কাটতে হবে। দিন কয়েক বাদে সেই সঙ্কল্প নিজের থেকেই বাতিল হয়ে গেছে। একটা অশান্ত আক্রোশে দিন কেটেছে। বাবা টের পাননি, মা পেয়েছেন বলে ধারণা।

...পরীক্ষা হয়ে গেল একদিন। ফলও ভাল হবে জানা কথাই। তার দিন কয়েকের মধ্যেই তাকে নিয়ে যাবার জন্য মামা এসে হাজির। এর আগের বারে, অর্থাৎ দুর্দিনের আগে যখন মামীর কাছে গেছে—একলাই গেছে। কিন্তু এবারে মামা নিতে এলেন। আগের থেকে এবারের যাওয়ার মধ্যে অনেক অনেক তফাৎ।

এই তফাৎ বোধটাই কতটা কুরে কুরে খাচ্ছিল তাকে, কারো ধারণা নেই। মা বললেন, যা, কি আর করবি, যেমন অদৃষ্ট, আমাাদর যা হয় হবে, তুই তো মানুষ হ।

একটা অসহ্য যন্ত্রণা নিজের ভিতরেই পিষে দিয়ে ছেলে জবাব দিয়েছিল, তোমাদেরও মন্দ কি হবে, আমি গিয়ে মামীকে বলে আরো কিছু বেশি টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করব'খন।

বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে বাবার তখন যা রোজগার, টেনেটুনে

মাসের পনের দিনও চলে না। মাস গেলে মামা টাকা পাঠান। সেই সূত্রে এই জবাব। আহত বিস্ময়ে মা মুখের দিকে চেয়েছিলেন চুপচাপ, কিন্তু মুখ দেখবাব জন্য ছেলে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেনি, হনহন করে সামনে থেকে চলে গেছে।

পরদিন নিজের সঙ্গে অনেক যোঝাযুঝি করে, আত্মসম্মন একরকম বিসর্জন দিয়েই মায়ের সামনে এসেছে আবার। জিজ্ঞাসা করেছে, আমাকে তাহলে মামার সঙ্গে চলে যেতেই হবে?

একেবারে জবাব না দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকাটা মায়ের স্বভাব। মনে হচ্ছিল জবাব আর দেবেনই না, শুধু চেয়েই থাকবেন। ...জবাবও দিয়েছিলেন, অনুচ্চ, স্পষ্ট। —হ্যাঁ এখানে থাকলে কলেজে পড়ার জন্য সেই মামীর কাছেই তো হাত পাততে হবে—

এক দুর্জয় আক্রোশে ছেলের সমস্ত চোখ মুখ থমথমে। আবারও জিজ্ঞাসা করেছে, যেতেই হবে তাহলে?

সেই এক ঠাণ্ডা কঠিন মূর্তি দেখা গেছিল মায়ের। জবাবের মধ্যেও মায়া দয়ার লেশমাত্র নেই যেন।—বার বার কি জিজ্ঞেস করিস, যেতে হবে কিনা তুই জানিস না? ঘরে বসে মুখ্খু হয়ে থেকে আমাকে স্বগ্গে তুলবি?

পরদিন রওনা হবার সময় পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে একটি কথাও হয় নি। মা বলেছেন, ছেলে চুপ। যাবার আগে বাবা মাকে প্রণাম করেছে, তখনো মায়ের মুখের দিকে তাকায়নি। মা তার মাথায় হাত রাখার আগেই দ্রুত সরে গেছে। যতক্ষণ দেখা গেছে তাকে, মা, অজু আব অমু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। অজুর দু'চোখ ছলছল করছিল, আব অমু তো দাদাকে ডেকে ডেকে কেঁদে সারা।

তারপর থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত একটা দুর্জয় অভিমান বুকের ওপর পাথরের মত চেপে বসেছিল। সেই পরিবর্তন মামীও অনুভব

করেছেন। কলেজের বড় ছুটি-ছাটায় নিজেই তিনি মায়ের কাছে ঘুরে আসার কথা বলেছেন। ছেলে মাথা নেড়েছে। যাবে না।

উঠ্‌তি বয়েসের সেই নিদারুণ মানসিক সংকট অনুপম চক্রবর্তী আজও ভোলেন নি। অথচ যুক্তি দিয়ে বুঝতে গেলে মনে হত, মা তাঁর ভাল ব্যবস্থাই করেছেন। বাড়িতে থাকলে পড়াশুনা যে হত না সেটা সত্যি কথাই। মামার সাহায্য কতকাল বজায় থাকত কে জানে। তাঁকে পেয়ে মামী ওই সংসারটার প্রতি আরো দরাজ হতে পেরেছিলেন। কিন্তু মনের ক্ষত যুক্তি মানে না। অভাবের তাড়নায় মা ছেলে দিয়ে দিয়েছেন এ কিছুতে ভুলতে পারতেন না।

মামাদের অত বড় বাড়িতে নিসঃঙ্গ দিন কাটত তাঁর। অন্য মামারা তখন যে যার পরিবার নিয়ে অন্যত্র স্থিতি হয়েছেন। বড় মামার দুই মেয়ের ঢের আগেই দূরে দূরে বিয়ে হয়ে গেছে। বৎসরান্তে এক-আধবার বাপের বাড়ি আসারও সুযোগ হত না তাদের। কিন্তু মামাবাড়িতে সঙ্গীর অভাব অনুপম বাবু কখনো বোধ করেন নি। বাড়ির কতকগুলো পোষা জীব আর মামী সঙ্গী। এক পাল হাঁস, এক ঝাঁক পায়রা, দুটো কুকুর, গোটা চারেক বেড়াল, রঙ বেরঙের দশ বারোটা খরগোস, একটা হরিণ, একটা বড় ময়ূর, আর খাঁচায় খাঁচায় হরেক রকমের পাখি—টিয়া ময়না কাকাতুয়া কোকিল মুনিয়া চন্দনা—কত কি। এই সব পোষ্যদের নিয়ে মামীর চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। শুধু এগুলোর তদারকের জন্যেই দুটো লোক বহাল ছিল, কিন্তু মামী তাদের খুব একটা বিশ্বাস করতেন না।

অবসর সময়ে এই পশু পাখিদের নিয়েই চমৎকার সময় কেটে যেত অনুপম বাবুর। এদের প্রতি তাঁর টান দেখে মামীও খুশি। টানটা আন্তরিক, পশু পাখিগুলোর স্বভাব চরিত্র আচার আচরণ খুঁটিয়ে লক্ষ্য

করতেন অনুপমবাবু। ক্রমশ ওরাই একটা নেশার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি যেন ওদের একান্ত আপনার জন। তাঁর মনে হত ওদের সুখ দুঃখও তিনি যেন বুঝতে পারতেন। লাইব্রেরী থেকে শুধু এক পর্যায়ের বইই সংগ্রহ করে তিনি নিবিষ্ট মনে পড়তেন—নানা রকম পশু পাখি জন্তু জানোয়ারের বই।

শীতের সময় ছুটির দিনে হাঁটু-জল তিস্তা পেরিয়ে বালুর ওপর দিয়ে কতদূর হেঁটে চলে যেতেন ঠিক নেই। সেই চড়ায় হরেক রকমেব পাখি এসে বসত। জলের ওপর সারি সারি বক মাছের প্রত্যাশায় এক ঠ্যাং তুলে পটের ছবির মত বসে আছে তো বসেই আছে। মাছের সন্ধান পেল তো চোখের পলকে কপ্। দেখতে মজা লাগত বেশ। চড়ায় কিছু একটা মরলে আকাশে বিশাল শকুনির দল চক্কর খেতে খেতে এক সময় ডাঙায় নেমে বসত। উদর পূর্তির ব্যাপারে সেগুলিরও একটা ঐক্যবদ্ধ রীতিনীতি লক্ষ্য করতেন। বিশাল চড়ার শেষ গিয়ে ঠেকেছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে। সেই জঙ্গলেও অনুপমবাবু বহুদিন গেছেন। মামাকে ধরে শিকারীর দলের সঙ্গেও গেছেন দুই একবার। কিন্তু গুলিবিদ্ধ শিকার দেখে রাতে ঘুম হত না, শরীর ঘুলাত। এক ধরণের যন্ত্রণাও হত। তাই কেউ শিকারে যাচ্ছে শুনলে তিনি আর ধারে কাছে ঘেঁসতেন না।

একসময় মামীর এই পশুশালাটিকে আরো অনেক বড় করে তোলার বাসনা হয়েছিল তাঁর। এমন কি দুই একটা বাঘের বাচ্চা এনে বড় করে তোলা যায় কিনা তাই নিয়েও মাথা ঘামিয়েছেন, মামীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। শুনে মামী হেসে বাঁচেন না। কিন্তু বই পড়ে পড়ে ভাগ্নেটির এমন বিশ্বাস যে, ঠিক মত পোষ মানাতে পারলে অতি হিংস্র পশুও বশ মানে। যাই হোক, চেষ্টা সত্ত্বেও বাঘের বাচ্চা জোটেনি।

চার বছর পর্যন্ত অর্থাৎ বি. এ. পাশ করা পর্যন্ত বাড়ির সঙ্গে কোনরকম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। বাবার শরীরের হাল ভাল না, ছেলে পড়ানোর রোজগার আরো কমছে, মামীর মুখে সে সব খবর শুনতেন। শোনার পরেও অনুপম চক্রবর্তী নির্লিপ্ত। মাসান্তে মামী তাঁর হাতে টাকা দিতেন, তিনি মনি অর্ডার করে আসতেন। ব্যস, বাড়ির সঙ্গে এটুকুই তাঁর সম্পর্ক।

মায়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন চার বছর বাদে কলকাতায় এম-এ পড়তে এসে। আগে কোনবকম জানান্ না দিয়ে হঠাৎ একদিন এসেছিলেন। মা চমকে উঠেছিলেন 'প্রথম, তারপর স্থির ঠাণ্ডা একেবারে। অনুপম চক্রবর্তী মাকে দেখেছেন। হাড়ের ওপর চামড়া বসানো। বুকের তলায় মোচড় পড়েছে, কিন্তু চার বছর আগে সেই আহত অভিমানেব তলায় সেটা চাপা পড়তে সময় লাগেনি।

অজু আর অমু কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমের চোখে দাদাকে দেখেছে। অজুটা ঢ্যাঙা আর রে'গা হয়েছে, অমুও রোগা-রোগা। তিন রাত্রি ছিলেন সেখানে, দম বন্ধ হবার উপক্রম। যেদিকে তাকান দারিদ্র্য যেন হাঁ কবে আছে।

মা জিজ্ঞাসা করছেন, কেমন দেখছিস সব?

অনুপম চক্রবর্তী নিরুত্তর।

মায়ের গলার স্বর নিরুত্তাপ, আবারও জিজ্ঞাসা করেছেন, এখান থেকে সরিয়ে তোর ক্ষতি করেছি খুব?

অনুপমবাবু এরও জবাব দেননি। এম. এ. পড়া অনুপম চক্রবর্তীর একটা সত্তা চার বছর আগের সেই অভিমানাহত ছেলেটার মানসিক সংকটের মধ্যে আটকে আছে। চোখে দেখার অনুভূতিটা ভিতরের সেই ছেলে মাথা ঝাঁকা দিয়ে বাতিল করে দিয়েছে। অনেকটা

নির্লিপ্ত বাইরের মানুষের মতই মেসে ফিরে গেছেন অনুপম চক্রবর্তী।

' পরের দু'বছরের মধ্যে কতকগুলো বিপর্যয় যেন ছকে বেঁধে এসেছে আর গেছে। বড়মামা আচমকা চোখ বুঁজেছেন, বড়মামী প্রায় ছ'মাস কাল শোকে অবিভূত। বড়মামার মৃত্যুর আট মাস বাদে বাবা গত হয়েছেন। অজুর নামে টেলিগ্রাম এসেছে তাঁর কাছে। মায়ের চোখে মুখে আঁতি-পাতি করে শোক খুঁজেছেন অনুপম চক্রবর্তী। খুঁজে কি দেখেছেন জানেন না। সেই অভিমানী ছেলেটা এতদিন বাদে ওই নীরব মূর্তির কোলের ওপর আছড়ে পড়তে চেয়েছে। কিন্তু তাও পারেনি। পরের বছরের শেষের দিকে, অর্থাৎ এম. এ. পরীক্ষার মাস কয়েক আগে প্রায় বিনা নোটিসে ওপার থেকে বড় মামীর ডাক এসেছে। অনুপম চক্রবর্তী যেন কর্তব্যের শেকলে বাঁধা। পড়াশুনার ক্ষতি করে ছুটে গেছেন, কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। স্বামী আর ছেলেপুলে নিয়ে বড় দুই মামাতো দিদি এসেছিলেন। বিষয় আশয়ের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কোনরকম মনোমালিন্যের কারণ ঘটেনি। মামীর শেষ লিখিত নির্দেশ মত সম্পত্তি আর টাকাকড়ি সমান তিন ভাগ করা হয়েছে। দুই বোন দু'ভাগ পেয়েছেন আর অনুপমবাবু একভাগ। মামীর পশুশালাটি শুধু তাঁর একার ভাগে এসেছে। এবারে বাস্তবের রাস্তায় হেঁটেছেন অনুপম চক্রবর্তী। বড় মামাতো বোন আর ভগ্নিপতির মনের ইচ্ছে বুঝে নামমাত্র মূল্যে নিজের ভাগের বিষয় তাঁদের বেচে দিয়েছেন। আর দরদী লোক খুঁজে খুঁজে পশু-পাখিগুলোকে দান করেছেন। নগদ যে টাকা নিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন তার পরিমাণ নিশ্চিন্ত আনন্দের স্রোতে গা ভাসানোর মত বেশিও নয়, আবার দিন যাপনের চিন্তায় ক্লিষ্ট হবার মত সামান্যও নয়। বাড়িতে বাঁধা অঙ্কের টাকা পাঠানো আর

নিজের খরচা ধরে বছর কয়েক চলে যাবে। তার পরের ভাবনা পরে।

বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ভাল ভাবেই এম. এ. পাশ করেছেন। তারপর নিজের খেয়ালেই লেখা ধরেছেন আবার। এবারে আর কবিতা নয়, নিছক গদ্য। আর কাগজ দেখে একের পর এক চাকরির দরখাস্ত ছেড়েছেন। এদিক থেকে তাঁর বরাত ভাল। পশু পাখি নিয়ে তাঁর কয়েকটা গল্প বড় কাগজে ছাপা হয়েছে, আর সরল আত্ম-বিশ্লেষণগত কয়েকটা জীবন-বাদের ফীচারও। অপ্রত্যাশিত ভাল একটা চাকরিও জুটেছে বলতে গেলে এই লেখার কল্যাণেই। আধা-সরকারী নাম-করা এক কেমিক্যালস্ ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের সহকারী প্রচার সচিব। আধা সরকারী বলতে বর্তমানে দেশের এইসব নবতম উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকার মোটা টাকা ঢালছেন। ট্রেনিং-পর্বে ভাল মাসোহারা, চাকরি পাকা হলে তো বেশ ভাল। তাঁর মুরুব্বি প্রচার সচিবটি প্রায় বৃদ্ধ। বছর কতক বাদে তিনি অবসর গ্রহণ করলে ওই দুর্লভ পদটিও তাঁর দখলে আসতে পারে।

···রঘুনাথ শাসমল···আর. এন. এস্.—মিস্টার শাসমল! অনুপম চক্রবর্তীর জীবনে এক স্মরণীয় মানুষ স্মরণীয় নাম। তাঁর কর্মের শুরুতে যিনি বৃহস্পতি, অকাল-অন্তে তিনিই শনি। কৃতজ্ঞতায় জীবনে ওই একটি দিলদরিয়া বেপরোয়া মানুষকে তিনি প্রভুর আসনে বসিয়েছিলেন, আবার ওই একটি মানুষকেই তিনি হত্যা করতে চেয়েছেন। মনে মনে হত্যা করেছেন, আজও করছেন। পারলে বাস্তবেও করতেন।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আপাতত আশা আর আশা। কথায় বলে আশা আর বাসা ছোট করতে নেই, আপাতত বাসার চিন্তা মাথায় নেই, বড় আশার বন্দরে জীবনের নৌকো ভেড়াতে

পেরেছেন।

কিছু হবে না ধরে নিয়েই ইন্টাবভিউ দিতে এসেছিলেন। ভিতরের ধর-পাকড় ভিন্ন এ-সব চাকরি হয় না বলেই ধারণা। ইন্টারভিউ যাঁরা নেবেন তাঁদের নিজের নিজেব প্রার্থী থাকে। ছিলও। পবে জেনেছেন প্রধান প্রচার সচিবের নিজেরই প্রার্থী ছিল।

কিন্তু রঘুনাথ শাসমলের খেয়ালী দাপটে তারা সকলেই ভেসে গেছে। এম. এ. পাস প্রায় সকল প্রার্থীই, লেখার অভ্যাস আছে শুনেই তাঁর আগ্রহ বেড়েছে। অনুপম চক্রবর্তী কি ছাই তখন জানতেন লোকটা সাহিত্য আর কাব্যানুরাগী? জেরার ফলে এই গুণটা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, আর ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখে ছাপা কাগজগুলো সামনে এাগয়ে দিয়েছিলেন। দেখে বেশ খুশি তিনি। বলেছেন, এই সব লেখাই তিনি পড়েছেন এবং ভাল লেগেছে। জিজ্ঞাসা করছেন, বিষয়বস্তুর এ বৈচিত্র্য তিনি পেলেন কি করে। অনুপমবাবু সবিনয়ে জবাব দিয়েছেন, প্রথমত তিনি সাইকোলজির ছাত্র, দ্বিতীয়ত পশু-পাখি তাঁর হবি।

অতএব পশু-পাখি নিয়েই জেরা শুরু করেছেন ভদ্রলোক। কোন্ পশু বা কোন্ পাখির দেহজ সারের উপাদান বেশি, খাদ্যে কি ধরনের রাসায়নিক বস্তু মেশালে কোন্ কোন্ পশু-পাখির দেহ পুষ্টি উন্নতি সম্ভব, ইত্যাদি। বরাত ক্রমে অনুপম চক্রবর্তী সঠিক জবাবই দিতে পেরেছেন। কমিটির অপরাপরেরাও নীরব শ্রোতা। ভদ্রলোক অতঃপর জিজ্ঞাসা করেছেন, চাকরি পেলে প্রচারের ব্যাপারে অভিনব গোছের কি ক্যামপেন আপনি সাজেস্ট করতে পারেন?

বিপাকে পড়ে অনুপম চক্রবর্তী এমন একটা জবাব দিয়ে বসে-ছিলেন যে ওই কর্তা ব্যক্তিটি সশব্দে হেসে উঠেছেন, এবং মাথা নেড়ে জবাবটা অনুমোদন করেছেন। ফলে অপর সকলকেও হাসতে

হয়েছে আর মাথা নাড়তে হয়েছে। তিনি বলেছেন যে দিনকাল, চাকরি পাব এমন আশা করে আসিনি, তাই এদিকটা ভাবাও হয়নি। চাকরি পাবার মত অভিনব ব্যাপার যদি ঘটে তো সাজেশানের মাথা আপনি খুলে যাবে আশা করি।

চাকরিটা তাঁরই হয়েছে। রঘুনাথ শাসমল সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের একজন তো বটেই, সব থেকে দাপটের মানুষও বটে। অনুপম চক্রবর্তী পরে জেনেছেন ইন্টারভিউ কমিটিতে তিনি যে থাকবেনই এমন কোন কথা ছিল না। চাকরিটা তাঁরই হওয়া বিধিলিপি বলেই ছিলেন হয়েতো।

আশা পূরণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাসার কথাও তাঁকে ভাবতে হয়েছে। বড় বাসা নয়, আপাতত ছোট বাসাই। আপিস থেকে একদিন মেসে ফিরে ছোট ভাই অজিতেশের একখানা চিঠি পেলেন। সসংকোচে লিখেছে, এবারে তার হায়ার সেকেণ্ডারি ফাইন্যাল পরীক্ষা, তার ফীস এখনো জমা দেওয়া হয়নি, দাদাকে ছাড়া কাকে লিখবে জানে না, পরীক্ষা দেওয়া হবে কি না সেটা দাদার উপরেই নির্ভর করছে।

পড়ে বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠেছে কেমন। আবার ভাইয়ের ওপর রাগও হয়েছে। তাঁর না হয় খেয়াল ছিল না, কিন্তু ভাই আগে লেখেনি কেন, আর লিখলই যদি এ-রকম করে লিখল কেন। সোজা লিখলেই তো হত, ফাইন্যাল পরীক্ষা, বাড়তি টাকা পাঠাও। পত্রপাঠ টাকা পাঠালেন, প্রয়োজনের থেকে কিছু বেশিই পাঠালেন।

মাস তিনেক সব চুপচাপ আবার। তারপর আবার একদিন আপিস থেকে ফিরে আর একখানা চিঠি পেলেন। এবারে মায়ের চিঠি। তিন লাইনের ছোট চিঠি।

> —আশা করি ভাল আছ। বিশেষ প্রয়োজনবোধে এই চিঠি লিখছি। সম্ভব হলে একবার আসবে। দরকারী কথা আছে। আসা সম্ভব না হলে জানাবে। —মা।

বার বার পড়ছিলেন, আর চোখের কোণ দুটো কি এক অজ্ঞাত অনুভূতিতে সিরসির করছিল। মনে হচ্ছিল, ওই তিন লাইনের মধ্যে মায়ের অন্তত তিন হাজার কথা চাপা পড়ে আছে। কিন্তু তিনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তিন লাইনের এই চিঠিব মতই দু-তিনটে দশটা দরকারী কথা শুধু বললেন।

পরদিনটা শনিবার। আপিসে দিয়ে সোম মঙ্গল দু'দিনের ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত করে দিয়ে সেইদিনই রাতের গাড়িতে রওনা হয়েছেন।

ভোরে যখন পৌঁছেছেন এক মা ছাড়া আর কারো ঘুম ভাঙেনি। অনুপম চক্রবর্তী অবাক একটু, মা যেন প্রস্তুত ছিলেন তিনি আজই আসবেন।

আয়।

মাকে প্রণাম করে ভিতরে এসে বসলেন। ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা অপরাধবোধ থেকে থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। মা অজু অমুকে ডেকে তুলে দিয়ে একজনকে পাঠালেন একটু মাছের খোঁজে আর একজনকে চায়ের। আড়াই বছর আগে যখন এসেছিলেন, মা তখন তাঁর চায়ের অভ্যাসের কথা জেনেছিলেন। দেড় বছর আগে বাবার মৃত্যুর পরে এসেও তিনি মায়ের হাতের চা পেয়েছেন।

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে অজু অমু তাঁকে ঢিপ-ঢিপ প্রণাম করে

যে যার কাজে ছুটল। মা উনুন ধরাচ্ছেন।

চা সংগ্রহ করে অমুই আগে ফিরল। অনুপম চক্রবর্তী কাছে ডাকলেন তাকে। এও বেশ ঢ্যাঙাই হয়ে উঠেছে। মুখখানা দুষ্ট দুষ্টু কিন্তু মিষ্টি। কাছে ডাকতেও এগিয়ে এসে একটু তফাতেই দাঁড়িয়ে গেল। দাদা যেন এক মহামান্য অতিথি ওদের কাছে। বুকের তলায় মোচড় পড়ল। দু'বছরের সেই অমুর মুখখানা মনে পড়ছে, দাদা মামাবাড়ি চলে যাচ্ছে দেখে যে ভ্যা-ভ্যা করে কাঁদছিল আর ডাকছিল, ও দাদা তুমি যেও না!—আজ? আজও কি তিনি ওদের একজন?

দাঁড়িয়ে পড়লি কেন, কাছে আয় না।

অমু সসংকোচে আর একটু কাছে এল।

কোন ক্লাসে পড়ছিস?

ক্লাস এইট।

পড়াশুনা ভাল হচ্ছে?

দ্বিধা কাটিয়ে অমু জবাব দিল, গেল বারে ফার্স্ট হয়েছিলাম বলে এবারে ফ্রী-শিপ পেয়েছি।

ফার্স্ট হাওয়াটা খবর না ফ্রি-শিপ পাওয়াটা, অনুপম চক্রবর্তী ঠিক ধরে উঠতে পারলেন না। ছোট ভাই শেষেরটুকু না বললেই যে খুশি হতেন।

চা আর খাবারের থালা হাতে মা ঘরে ঢুকলেন। সেগুলো সামনে রেখে অমুর দিকে ফিরলেন। অনুচ্চ গম্ভীর সুরে বললেন, গেল বারে ফার্স্ট হয়ে যা পেয়েছে, এবারে ফেল করে সেটা কাটা যাবে এ খবরটা কে দেবে?

অমু যেন পালিয়ে বাঁচল। অনুপম চক্রবর্তী হাসতে চেষ্টা করলেন।—পড়াশুনা কিছু করছে না বুঝি?

মা সে-কাথার জবাব না দিয়ে বললেন, খেয়ে নে, জুড়িয়ে যাবে।

মায়ের দিকে চেয়ে এবারে কেন যে একটা অস্বস্তি বোধ করেছেন অনুপম চক্রবর্তী জানেন না। কেন তাঁকে ডাকা হয়েছে তাও না। কেবলই মনে হয়েছে মায়ের ভিতরটা কিছু একটা সঙ্কল্পে স্থির। সেই পুরনো অভিমানের প্রশ্রয় দিতে গিয়ে দেখেন আগের মত ওটাও যেন আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে না। অথচ সেই বেদনাদায়ক ব্যবধান থেকেই গেছে।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার আগে কোন কথাই হল না। লক্ষ্য করলেন, অজুটাও যেন সেই থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সামনা-সামনি পড়ে গেলে ব্যস্ত মুখে করে অন্য দিকে সরে যাচ্ছে। মনে পড়তে ওকেও ডেকে পরীক্ষার খবর জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মাথা চুলকোতে দেখে মনে হয়েছিল ফেল মেরেছে, কিন্তু শুনলেন পাস করেছে এবং ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। দিন কয়েক আগে নাকি রেজাল্ট বেরিয়েছে।

মৃদু অনুশাসনের সুরে বলেছেন, ভাল পাশ করেছিস আমাকে জানাবি তো! অজু জবাব না দিয়ে সরে গেছে। অনুভব শক্তিটা অনুপম চক্রবর্তীর বরাবরই প্রখর। তখনই মনে হয়েছে এই ভাইয়ের পড়াশুনার ব্যাপারেই মা ডেকেছেন। আর তখনই সেই পুরনো অভিমানটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে।

দুপুরে মা ঘরে এসে দাঁড়ালেন। অনুপম চক্রবর্তী মেঝের শয্যায় উঠে বসলেন।—তোমার খাওয়া হয়েছে?

খাব'খন। তোর কি আজ থাকার সুবিধে হবে?

শোনা মাত্র সেই পুরনো দুর্জয় অভিমানটা যেন দুরতিক্রমনীয় হয়ে উঠল। মুখে কঠিন রেখা পড়তে লাগল একটা দুটো করে। জবাব দিলেন, ইচ্ছে আছে, কি বলবে বল।

এখন থাক, ঘুমো তাহলে।

দিনে ঘুমনোর অভ্যাস নেই : তুমি বল।

তাঁর মুখের আর গলার স্বরের পরিবর্তনটুকু মা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু স্থির ঠাণ্ডা মুখ তাঁর। আর একটু এগিয়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। বললেন, আমি না-হয় তোর কাছে অনেক দোষ করেছি···তোর ভাইয়েরা কি দোষ করেছে?

কেন? ছেলের চাউনিও নরম নয়।

অজু সাত মাইল দূরের এক কারখানায় চাকরির চেষ্টা করছে। ···করবে?

অনুপম চক্রবর্তী হঠাৎ যেন ধাক্কা খেলেন একটু।—সেকি, আর পড়বে না? সেটাই জিজ্ঞেস করছি। তোকে লিখতে বলেছিলাম, ওর লিখতে আপত্তি। আমি ওকে বলেছি পড়াশুনার শেষ চেষ্টা করে চাকরিতে ঢুকলে আমার আর তাকে দরকার নেই—অন্যত্র থেকে চাকরি করতে পারে।

মায়ের টান-ধরা ঠাণ্ডা মুখে হঠাৎ যেন এক অনমিত প্রাণের শিখা দেখলেন তিনি। একটু ভেবে বললেন, অজু আমার সঙ্গে চলুক তাহলে, হস্টেলে থেকে কলেজে পড়বে।

আর অমুর কি হবে?

সে এখানে পড়বে না?

আমার ইচ্ছে নয়, অনেক রকমের সঙ্গী জুটেছে, কথার অবাধ্য হতে শুরু করেছে, এখানে থাকলে পড়াশুনা হবে না। হলেও অমানুষ হবে।

এ-কথা শোনার পর সমস্যা যেন আরও সহজ হয়ে গেল। জবাব দিলেন, বেশ, এখানকার পাট তুলে দাও তাহলে, আমি কলকাতায় একটা বাসা ঠিক করে তোমাদের জানাচ্ছি।

চোখে চোখ রেখে মা নীরব একটু।—কলকাতায় বাসা করার মত তোর সঙ্গতি আছে?

অনুপম চক্রবর্তী হঠাৎ যেন বিব্রত বোধ করলেন একটু। সে-ভাব কাটিয়ে জবাব দিলেন, একটা চাকরি পেয়েছি, মোটামুটি ভালই চাকরি, আর তিন মাস বাদে পাকা হবে, তখন জানাব ভেবেছিলাম ·· বাসা করে ভাল ভাবে থাকার মত মাইনে এখন নয়, মামীর দেওয়া টাকা থেকে কিছু কিছু ভাঙলে চলে যাবে।

মা অপলক চেয়ে রইলেন খানিক। সে-দৃষ্টির সামনে ছেলের ছু'চোখ কেন যেন স্থির হতে পারছে না। অস্বস্তি বোধ করছেন।

ঠাণ্ডা সংযত স্বরে মা বললে, এখানকার পাট তুলতে হবে না, আপনি উঠে যাবে। তোর বাবার অসুখের সময় বাড়ির অর্ধেক বন্ধক ছিল, পরের কাজে আর এই এক বছরের খরচের চাপে এখন সবটাই বন্ধক। বেচতে পারলেও হাতে কিছু আসবে না।

মায়ের কথাগুলো যেন কেটে কেটে মগজে বসে যাচ্ছে।—হ্যাঁ, বাবার মৃত্যুর পর এসে বাড়ি বন্ধকের কথা তিনি শুনে গেছিলেন। কিন্তু তারপর ভুলে গেছেন, অনায়াসে ভুলতে পেরেছেন। আশ্চর্য!

ছুই এক মুহূর্ত থেমে মা আবার বলে গেলেন, অজু আর অমু ছুজনেই জানে আজ অবধি তোর জন্যেই ওরা খেয়ে পরে আছে। মানুষ হবার পরে সেটা যেন চিরকাল মনে থাকে সে-কথাও আমি ওদের বলে দেব।—বাসা ঠিক হয়েছে চিঠি পেলেই আমি ওদের ছুজনকে তোর কাছে পাঠিয়ে দেব।

ঠাণ্ডা কথাগুলো যেন চাবুকের মত মুখের ওপরে এসে পড়ছিল। শেষের কথা ক'টা কানে আসতে চমকে উঠলেন। ওদের ছুজনকে পাঠাবে মানে। তুমি যাবে না?

তেমনি ধীর স্থির ঠাণ্ডা মুখে মা জবাব দিলেন, না।

এই 'না'. যেন এক অন্তিম দণ্ড ঘোষণা। মুহূর্তে সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে অনুপম চক্রবর্তীর। গলা দিয়ে একটা অস্ফুট স্বর নির্গত হয়েছিল, সে কি, কেন!

ষোল বছর বয়সে মামাবাড়ি যাবায় সময়, যে-কথা বলে গেছিলি সে-কথা আমার মনে আছে। তারপর থেকে এ-পর্যন্ত অনেক কিছু দেখছি। সে-সব কথা থাক বাবা, আর তোর ভার বাড়াব না, ওরা তুটোই যথেষ্ট, আমাব জন্যে ভাবতে হবে না--

দরজার দিকে পা বাড়ালেন। হঠাৎ এক ঝলক বক্ত উঠে এল যেন অনুপম চক্রবর্তীব চোখে মুখে। –শোন!

মা ঘুরে দাঁড়ালেন।

কলকাতার বাড়িতে তুমি যাচ্ছ না তাহলে? প্রায় কর্কশ কণ্ঠস্বর।

তেমনি স্থির, তেমনি ধীর, তেমনি ঠাণ্ডা মায়ের মুখ। চেয়ে রইলেন কয়েক পলক।—না। চলে গেলেন।

উঠে অশান্ত ক্ষোভে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগলেন অনুপম চক্রবর্তী। ষোল বছর বয়সে মামাবড়ি যাবার আগে কি বলেছিলেন তিনি? কি?

মা বলেছিলেন, আমাদের যা হবার হবে তুই তো মানুষ হ। জবাবে সেই ষোল বছরের ছেলে বলেছিল, তোমাদেরও মন্দ কি হবে, আমি গিয়ে মামীকে বলে আরো কিছু বেশি টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করব'খন।

তারপর এই সাত বছরে মা আর কি দেখেছে? দেখেছে বই কি, ছেলের নির্লিপ্ত ব্যবধান রচনা দেখেছে। কিন্তু এই দেখাটাই কি সব? ছেলের মানসিক যন্ত্রণা দেখেনি? কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই ক্ষোভের আশ্রয়টুকুও গেল যেন। হঠাৎ তাঁর নিজেরই

মনে হল, তাঁর সেই যন্ত্রণা যন্ত্রণা-বিলাস ছাড়া আর কি? মায়ের সেই এক সিদ্ধান্তের ফলেই তিনি মানুষ হয়েছেন, ভাই দুটোকেও টেনে তোলার সুযোগ পাচ্ছেন। সেদিন এই মা দুর্বল হয়ে পড়লে আজ কি দশা হত সেটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন। দেখে শিউরে উঠলেন।—স্বার্থপর, তাঁর মত এতবড় স্বার্থপর পৃথিবীতে আর কেউ আছে নাকি!

মাথার ভিতরটা দপদপ করছে। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাইরের আড়ালে অজু দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতে অপ্রতিভ একটু। অনুপমবাবু ডাকলেন, শোন্ তো—

অজু ভিতরে এল। বিমর্ষ মুখ। বললেন, মা কি বলে গেল শুনলি?

অজু মাথা নাড়ল, শুনেছে। তার দু'চোখ ছলছল করছে লক্ষ্য করলেন। গলা খাটো করে অজিতেশ বলে ফেলল, মা কি ঠিক করেছে জানো দাদা?

কি করে জানব, তোরা তো আমাকে আপনার জন ভাবিস না।

অজিতেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, সে কি দাদা, তুমি ছাড়া আমাদের আর কে আছে—

মা কি ঠিক করেছে?

এখানে একটা মঠ আছে, সেই মঠে অনেকগুলো ছেলে থাকে। মঠের বুড়ো বাবাজী মাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁর সঙ্গে মায়ের কথা হয়েছে আমাদের কলকাতায় তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে মা সেখানে থাকবে। মা সেখানকার ছেলেদের জন্য দু'বেলা রান্না করে দেবে, তার বদলে থাকতে খেতে পাবে, আর মাস গেলে বাবাজী কয়েকটা টাকা হাত-খরচও দেবেন বোধহয়। মা আমাকে কিছু বলেনি, ওই মঠের একজনের কাছ থেকে শুনেছি।

কানে যেন গলানো গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছে অজিতেশ। দাদার সেই মুখ দেখেই ভয়ে ভয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

অনুপম চক্রবর্তী এম. এ. পাস, গত কয়েক মাসে তাঁর আরো কিছু লেখা ছাপা হয়েছে, আপিসের প্রবল কর্তা-ব্যক্তি রঘুনাথ শাসমল খুশি হয়ে তাঁর পিঠ ছাপড়েছেন, সামনে বড় চাকরির বাঁধা-ধরা প্রতিশ্রুতি, তারপর আরো উজ্জ্বল ভবিষ্যত। কিন্তু নিমেষে তাঁর সব-কিছু, এমন কি তাঁর অস্তিত্ব সুদ্ধ যেন মিথ্যে হয়ে গেছে। কে যেন খুব উঁচু থেকে এক মহাশূন্য অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে।

বিকেল গড়াল, সন্ধ্যে পেরুল। স্তব্ধ অনুপম চক্রবর্তী সেই থেকে ঘরের মধ্যে বসে। অজু আর অমু উতলা মুখে বাইরে ঘুরঘুর করেছে, ভিতরে ঢুকতে সাহস করেনি। দাদাকে যন্ত্রচালিতের মতই ঘর থেকে বেরিয়ে ভিতরের দিকে যেতে দেখল তারা। যে খুপরিতে বসে মা আহ্নিক করে সেই দিকে।

হ্যাঁ, সেইদিকে সেইখানেই যাচ্ছেন অনুপম চক্রবর্তী। দরজার সামনে দাঁড়েলেন। বদ্ধ গরম গুমোট খুপরি একটা। প্রদীপ জ্বলছে। মা আহ্নিক করছেন।

ভিতরে আসব মা ?

মাথা ঘুরিয়ে মা আস্তে আস্তে তাকালেন। কাপড়ের তলায় জপের আঙুল নড়ছে। মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, অপলক দৃষ্টি।

সেটুকুই অনুমতি ধরে নিয়ে ছেলে ভিতরে ঢুকলেন। এক-হাত ফারাকে মেঝের ওপরেই বসে পড়লেন। মা চেয়েই আছেন।

তারপর হঠাৎই সাত বছরের এক জমাটবাঁধা অনুভূতি বিপরীত, বিপর্যয়ে শতধা হয়ে ভেঙে পড়ল যেন। সেটাকে ভিতরে ঠেলে দেবার চেষ্টায় সর্বাঙ্গ কেঁপে কেঁপে উঠল বারকয়েক। তারপর স্থান কাল ভুলে ছোট শিশুর মতই দু'হাতে মাকে আঁকড়ে ধরে কোলে

মাথা গুঁজে হু হু করে কেঁদে উঠলেন। একটা কান্নার পাহাড় যেন ভেঙে ভেঙে মায়ের কোলে ঝরে পড়তে লাগল।—মা মাগো, আমার মা—আমাকে তুমি ঠেলে ফেলে দিও না—আমাকে শাস্তি দাও—মারো—আমাকে তুমি ঠেলে ফেলে দিও না—

মায়ের দু'গাল বেয়ে নিঃশব্দে ধারা নেমেছে। তাঁর একখানা হাত মাথার ওপর নেমে এল, মাথা থেকে পিঠে। মাথা আর সমস্ত পিঠে মায়ের হাতের স্পর্শ ছড়াতে লাগল। ছেলের দু'হাত মাকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরল, মায়ের কোলে মাথাটা আরো বেশি গুঁজে যেতে লাগল।

···কিছুক্ষণ, অনেকক্ষণ।

ওঠ!

কেঁদে কেঁদে বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়েছে, জুড়িয়ে গেছে। মাথা তুলে ছেলে মায়ের দিকে তাকালেন। তাঁর মাকে কেউ কোনদিন রূপসী বলেনি, কিন্তু মায়ের মত এমন কমনীয় রূপ আর বুঝি দেখেননি।

কলকাতায় বাড়ি ঠিক করে তুই নিজেই এসে আমাদের নিয়ে যাস।

অদূরে আবছা আঁধারে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে দাদার এই বিচিত্র কাণ্ড দেখছিল অজু আর অমু। মায়ের কথাগুলো কানে আসতে দুজনেরই মনে হল, দাদা ওদের দেবতা গোছের কেউ।

নিজের ভিতর এমন এক আনন্দের খনির সন্ধান অনুপম চক্রবর্তী আর কি কখনো পেয়েছেন? তিনি যেন পাখির মত উড়তে পারেন, ভিতরটা এমনি হালকা সর্বদা। সমস্ত কাজে তেমনি উদ্যম আর উদ্দীপনা। আপিসে ক্লান্তি নেই, বাড়িতে ক্লান্তি নেই, লিখে ক্লান্তি নেই।

দাদা যে আসলে এত ছেলেমানুষ অজিতেশ আর অমিয় ভাবতেও পারেনি। কলকাতার বাড়িতে দাদার কাণ্ড দেখে তারা হাসে। আপিস থেকে এসেই জুতো খুলল, আর টাই খুলে কোথায় ছুঁড়ে ফেলল ঠিক নেই, তাবপর বাচ্চা ছেলেব মতই মায়ের কোলে শুয়ে পড়ল। বুড়ো ছেলের অমন আদর খাওয়া ওবা আর দেখেনি। ওদের হাসতে দেখলে দাদার খুন-সুটি সুরু হয়।—মা আসলে আমার, তোরা তো ফাউ।

মাকে বলেন, ওদের আমি কেমন মানুষ করি দেখে নিও, আমার থেকে ঢের বড় হবে—

মা বলেন ঢের বড়তে কাজ নেই বাবা, তোর পায়ের আঙুলের যোগ্য হলেই আমি ঢের ভাবব—

খবরদাব মা! ছেলে সত্যিই ক্রুদ্ধ যেন।—আমার থেকে অনেক অনেক বড় হ:ত হবে ওদের। ভাইদের উদ্দেশে চোখ পাকান, এ-বেলায় আমার সঙ্গে খাতির নেই, বুঝলে?

অবসর পেলে নিজে পড়ান, আবার ওদের জন্য মাস্টারও রেখেছেন একজন। চাকরি পাকা হবার পর মাইনে বেড়েছে, কিন্তু তাতেও কুলোয় না। প্রায় মাসেই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হয়। মা বলেন, এত খরচ করিস কেন, আবার মাস্টারের কি দরকার—

ছেলের মুখে প্রসন্ন হাসি।—বুঝতে পারছে না মা, মূলধন খাটাচ্ছি, ওরা আমার দু'খানা হাত—শক্তপোক্ত না কবলে চলে!

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর লিখতে বসেন। বড় গল্প লিখতে গিয়ে সেটা একটা উপন্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে পা দিয়েছেন যেন তিনি। যাতে হাত দেবেন, সোনা ফলবে। উপন্যাসখানা এক মাঝারি গোছের সাপ্তাহিকে ছাপা হতে লাগল। অবশ্যই বিনা পারিশ্রমিকে। ছাপা যে হচ্ছে

সেটাই পারিশ্রমিকের ঢের বেশি। ধারাবাহিকভাবে সেটা ছাপা হয়ে যেতে বহু পাঠকের প্রশংসা পেলেন, চিঠি পেলেন। জীবন ঘোষ সেই প্রথম উপন্যাসের প্রকাশক। প্রথম বইয়েই যে-লেখকেরা মোটামুটি নাম করেছেন অনুপম চক্রবর্তী সেই সারির একজন।

বুদ্ধি করে সেই প্রথম বই উৎসর্গ করলেন তাঁদের বড় অফিসার আর. এন. এস-এর নামে। একটা কারণে সঙ্কোচ ছিল। ফার্মের সহকর্মীদের কাছে তাঁর সুনাম নেই। খামখেয়ালি স্বেচ্ছাচারী বলে সকলে। তার ওপর মদ পেলে জল খায় না নাকি। আরো আনুষঙ্গিক দুর্নামও আছে কিছু। তাঁর নামে বই উৎসর্গ করাটা অন্য লোক স্রেফ চাটুকারিতা ভাববে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপম চক্রবর্তী পরোয়া করেননি। ওই লোকের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

রঘুনাথ শাসমল খুশি। বইটা পড়ার পর তো খুশিতে আটখানা। অকৃপণ উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করেছেন, চমৎকার হয়েছে, তুমি তো দেখি রত্ন একখানা, অ্যাঁ! কাগজের সমালোচকরাও সেই বইয়ের প্রশংসা করেছেন। প্রকাশক জীবন ঘোষ তখন থেকেই তাঁর পিছনে লেগে আছেন। মাঝারি মাসিক সাপ্তাহিক ছেড়ে নামী মাসিক, সাপ্তাহিকের সম্পাদকরাও ক্রমে সেই নবাগত লেখকের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন।

সামনের এই দ্বিতীয় পথও প্রশস্ত।

॥ চার ॥

অনুপম চক্রবর্তীর জীবনে প্রথম বিস্ময় মাকে ফিরে পাওয়া। দ্বিতীয় বিস্ময় শ্রীলেখা। রক্তমাংসের একটা মেয়ের মধ্যে নিজেকেই যেন আর একদফা নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সঙ্গে ওই মেয়েকেও।

কয়েক বছর পরের কথা। মেজ ভাই অজিতেশ তখন এম. এসসি. ফাইন্যাল ইয়ারে পড়ছে আর ছোট ভাই অমিয় খুব ভালভাবে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। তাকে হস্টেলে রেখে পড়াতে অনেক খরচ। মামীর দেওয়া টাকা অর্ধেকে নেমে

এসেছে। এই সময় মা বড ছেলের বিয়ের তাগিদ দিচ্ছিলেন প্রায়ই।

অনুপমবাবু বলতেন, দাঁড়াও, একটু সামলে নিই।

মা একদিন বললেন, আর সামলেছিস, ভাইদের জন্যেই তো ফতুর হয়ে গেলি।

অজু অমু দুজনেই সামনে উপস্থিত তখন। অনুপমবাবু রেগেই গেছিলেন প্রায়, আচ্ছা মা, এ-সব শুনতে ওদের কেমন লাগছে বল তো—ওরা দাঁড়ালে আমার আবার ভাবনা!

অজু হেসে বলেছিল, মায়ের সত্যি কথায় আমাদের একটুও লাগে না, আসলে তুমি যে কি মানুষ দাদা তুমি নিজেই জানো না।

মা অমনি বলেছেন, তোরা জানলেই হবে, তোরা মনে রাখলেই হবে। বড় ছেলের দিকে ফিরেছেন, কিন্তু তা বলে তুই বিয়ে করবি না, মেয়ে তোর আর কত খরচ বাড়াবে!

ছেলের হাসি মুখের জবাব শুনে মা হতভম্ব।—খরচ কত বাড়বে জানি না, কিন্তু একটা মেয়ে এসে ছেলের মাকে আর ভাইদের খরচের খাতায় লিখে দিয়েছে সে-রকম নজির দেখাতে পারি।

কিন্তু নিজের জীবনে অনুপমবাবু নিজেই তার উল্টো নজির দেখেছেন। শুধু তিনি কেন, মা আর ভাইয়েরাও দেখেছে।

অনুপম চক্রবর্তী তখন ফার্মের দস্তুরমত নির্ভরযোগ্য সহকারী প্রচার সচিব। নামে সহকারী হলেও বেশির ভাগ দায়িত্ব তাঁরই কাঁধে। মুখ্য প্রচার সচিব। ভদ্রলোক ক্রমাগত অসুখে ভোগার দরুন তাঁর কাঁধে দায় চাপিয়ে নিশ্চিন্ত।

ফার্মের কাজে সেবার ভুবনেশ্বরে এসেছেন। ভুবনেশ্বর থেকে পুরী আর কতটুকু! কাজের শেষে দিনকতক সেখানে থাকার প্ল্যান। তাই এসেছেন। নিয়তির নির্বন্ধ বলেই এসেছেন।

বীচ-এর অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি দিকে হাঁটছিলেন আর সমুদ্র দেখছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয় তখন। অশান্ত সমুদ্রের এ-সময়ে আর এক শোভা। ডুবন্ত সূর্যের শেষ আভায় বিশাল ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে যেন হাজার হাজার সোনার দানা ছড়াচ্ছে।

শুনুন!

পিছনে উদ্‌বিগ্ন রমণীকণ্ঠ শুনে ঘুরে দাঁড়ালেন। হন হন করে একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে, তাঁকেই ডাকছে। কাছে এসে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, দেখুন, ওই ছেলেগুলো সেই থেকে পিছনে লেগেছে আর যা-তা বলে অপমান করছে, কালও এ-রকম করেছিল, আজ আরও বেড়েছে, ওদের মতলব ভাল না—দয়া করে ওদিকটায় একটু এগিয়ে দেবেন?

অনুপম চক্রবর্তী ফিরে দেখলেন। গজ তিরিশেক দূরে তিনটে জোয়ান ছেলে দাঁড়িয়ে এদিকে চেয়েই দাঁত বার করে হাসছে। জায়গাটা নিরিবিলি বটে, কিন্তু কিছু লোক চলাফেরা করছেই। তার মধ্যে এই কাণ্ড। এখানে এসে দুই একটা বীচ-স্ক্যাণ্ডালের ঘটনা শুনেছেন অনুপমবাবু, কিন্তু ওরা যে এই গোছের বেপরোয়া ভাবতে পারেন নি। হঠাৎ মেয়েটির ওপরই একটু বিরূপ হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, কালও এ-রকম হয়েছিল তো আজ আবার একলা এ-ভাবে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন কেন?

মেয়েটির মুখ লাল। একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে তক্ষুনি আবার ফিরে চলল। ছেলেগুলোর কাছাকাছি হতে ওরা জোরেই হেসে উঠল। মেয়েটি সোজা এগিয়ে অদূরে বালির ওপর বসা একটি বুড়ো ভদ্রলোকের বাহু ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করল। ছেলেগুলো গুটি-গুটি সেই দিকে এগিয়ে চলল।

বুড়ো ভদ্রলোক নিয়েকে এগোবার আগেই ওরা তিন থেকে

ছেঁকে ধরল তাদের। অনুপমবাবু এক-রকম ছুটেই সেখানে উপস্থিত হলেন। ছেলেগুলো হাসছে আর টানা টানা বাংলায় বলছে, এক্ষুণি যাবে কি দিদি, সন্ধ্যেটা হোক, সাঁঝের সমুদ্রের শোভা যেমন হওয়াও তেমনি।

এই! কি মতলব তোমাদের?

তারা ঘুরে তাকাল। চোখগুলো ঘোরালো হতে থাকল। ব্যঙ্গ হেসে একজন জবাব দিল, তুমি কে চাঁদ? শিভালরি দেখাতে এসেছ! ভালয় ভালয় কেটে পড়, এই মহিলা আমাদের অপমান করেছে, তার জবাব না নিয়ে ছাড়ছি না। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বিবর্ণ মুখ, হাঁপাচ্ছেন আর কাঁপছেন।

দুই হাতের ধাক্কায় মেয়েটির গা-ঘেঁষা ছেলেটা তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অপর দু'জন মারমুখি। কিন্তু অনুপম চক্রবর্তীর ঠাণ্ডা হুমকি শুনে থমকাতে হল তাদের। কঠিন গলায় স্পষ্ট ইংরাজিতে তিনি বললেন, ঠাণ্ডা মাথায় আগে আমার কথাটা শুনে নাও বীরপুরুষেরা, আমি কে সেটা কাল তোমরা টের পাবে, আপাতত তোমরা তিন জন আর আমি একা—আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি, তোমরা কতটা খোয়াতে রাজি আছ?

হাবভাব দেখে হোক, বা ইংরেজি হুমকি শুনে হোক ওরা ভড়কে গেল। তবু যাবার আগে শাসিয়ে গেল, আচ্ছা কাল তোমাকেও দেখব, এদেরও দেখব—আমাদের চেনো না।

কাঁপতে কাঁপতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরলেন, বাঁচালে বাবা তুমি আমাদের, কি শয়তান ওই ছেলেগুলো, দু'দিন ধরে অপমানের একশেষ করছে মেয়েটাকে—

অনুপম চক্রবর্তী ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালেন মেয়েটির দিকে। সেও সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকেই চেয়ে আছে। এখানকার

কোন হোমরা চোমরা লোক ভাবছে মনে হল। অনুতাপের স্বরে বললেন, ইনি সঙ্গে ছিলেন জানতাম না, কিছু মনে করবেন না। বুড়োর দিকে ফিরলেন, আপনি কি অসুস্থ নাকি?

আর বাবা অসুস্থ, আমার জন্যেই তো মেয়েটার যত গেবো!

মেয়েটি বলল, জ্যাঠামণি, হোটেলে ফিরে চল, ও বাঁদরগুলো কোথায় আবার ঘাপটি মেরে বসে আছে কে জানে। আপনি আমাদের একটু এগিয়ে দিন না–

অনুপমবাবু বললেন, কিছু ভয় নেই, এখন ফিরলেই বরং ওরা ঘাবড়েছি ভাববে, তার থেকে আরো একটু বসা যাক, তারপর পৌঁছে দেব'খন। কোন্ হোটেল আপনাদের?

অপেক্ষাকৃত একটা শস্তার হোটেলের নাম করল মেয়েটি।

বুড়োকে ধরে অনুপমবাবু যেখানে কিছু লোকজন আছে সেইখানে এসে সমুদ্রের ধারে বসালেন। বুড়োর ওপাশে মেয়েটি এপাশে অনুপমবাবু। এরই মধ্যে নিজের সমাচার শোনাতে শুরু করেছেন ভদ্রলোক, তাঁর নাম চিন্তামণি ঘোষাল, আপিসের ছাপোষা কেরাণী ছিলেন, বছর দুই হল রিটায়ার করে পর্যন্ত হাইপ্রেসার আর হাঁপানি রোগে ভুগছেন। বাড়ীতে ছেলেরা আছে, ছেলের বউরা আছে, কিন্তু বুড়ো যেন তাদের গলগ্রহ, আগ বাড়িয়ে দেখাশুনাটুকু পর্যন্ত করে না। যেটুকু পারে করে এই বাপ আর মা মরা ভাইঝিটা, ভাইঝির নাম শ্রীলেখা ঘোষাল। ওর বাপ মস্ত চাকুরে ছিল, কিন্তু মেয়েটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে অকালে পালাল হতভাগা। মেয়েটার নামে বাপ কিছু টাকা রেখে গেছিল, সেই টাকা ভেঙে ওর লেখা-পড়া ভরণ-পোষণ চলছে, আর সেই টাকা ভেঙেই জোরজার করে জ্যাঠামণিকে নিয়ে এসেছে পুরীর সমুদ্রের হাওয়া খাওয়াতে— ডাক্তাররা বলেছে এতে উপকার হবে। উপসংহারে বললেন, এখন

বিপত্তি দেখ, হাওয়া খাওয়া মাথায় থাক, মান-সম্ভ্রম নিয়ে কলকাতায় পালাতে পারলে বাঁচি—কালই তুই টিকিট কেটে ফ্যাল লেখন।

একটা মেয়েকে ভাল লাগতে কি খুব বেশি সময় লাগে? অনুপমবাবু জানেন না। লেখার মধ্য দিয়েও মানুষের বুকে দরদ খোঁজেন তিনি, জ্যাঠার কথাগুলো শুনে দু'কান যেন ভরে গেল অনুপম বাবুর। ঝুঁকে শ্রীলেখার মিষ্টি মুখখানা দেখে নিলেন একবার। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের আর কতদিন থাকার ইচ্ছে ছিল?

চিন্তামণি ঘোষাল জবাব দিলেন, আরো দিন সাত আট তো বটেই, তাই না রে লেখন?

শ্রীলেখার জবাব শোনা গেল না। অনুপম চক্রবর্তী বললেন, তাহলে থেকে যান, কি করবে ওরা, বিকেলে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব'খন—

আশান্বিত মুখে বৃদ্ধ তাঁর দিকে তাকালেন, তুমি কি বাবা এখানকার কোন বড় অফিসার নাকি?

তিনি হেসে জবাব দিলেন, না, আমিও দিন কয়েকের জন্যে বেড়াতেই এসেছি···অতি সামান্য লোক, ওদের ওই রকম করে না বললে ওরা ঘাবড়াত না।

জ্যাঠার পাশ থেকে উদ্‌বিগ্ন মুখে শ্রীলেখা ঝুঁকল একটু।—কি আশ্চর্য, ওরা তিনজন মিলে যদি চড়াও হত আপনার ওপর?

হলে বিপদ হত, কিন্তু বাধা পেলে ওদের সচরাচর অত সাহস হয় না।

না হয় না, কাল দেখবেন আরো বেশি ছেলে নিয়ে দল বেঁধে আসবে।

আচ্ছা কাল না হয় আমি অন্য ব্যবস্থাও করব, এখানকার এস্. পি-কে জানিয়ে রাখব ব্যাপারটা।

চিন্তামণি বাবু সায় দিলেন, সেই ভাল, মেয়েটা চেষ্টা-চরিত্র করে বুড়ো জ্যাঠামণিকে এতদূর টেনে এনেছে, এরই মধ্যে ফিরতে হলে ওর ভয়ানক দুঃখ হবে, তাছাড়া আমারও ভালই লাগছিল·· তোমার নামটি তো বাবা শোনা হল না ?

বললেন।

জ্যাঠার পাশ দিয়ে উৎসুক মুখে শ্রীলেখা এবারে আরো বেশি ঝুঁকল।—অনুপম চক্রবর্তী মানে···লেখক অনুপম চক্রবর্তী নাকি !

লেখক জীবনে এমন খুশিব খোরাক অনুপমবাবু জীবনে আর কি পেয়েছেন ? হেসে জবাব দিলেন, একটা পরিচয় তাই বটে, চাকরিও করি।

আকাশে চাঁদ উঠেছে, কিন্তু সেই আলোয় মুখ ভালো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মেয়েটির মুখের সপুলক বিস্ময় যেন তিনি অনুভব করলেন।

চিন্তামণিবাবু বললেন, তুমি তো তাহলে মস্ত একজন লেখক, মানে বই-টই আছে নাকি ?

জবাবটা তাঁর ভাইঝিই দিল, আমি চার পাঁচখান পড়েছি, ইনি খুব ভাল লেখেন জ্যাঠামণি।

চিন্তামণি ঘোষাল সানন্দে বলে উঠলেন, ওই পাজী ছোঁড়াগুলোর কল্যাণে আমাদের তো বেশ ভাল লাভ হল তাহলে।

টানা সাত দিন সকালে দুপুরে বিকেলে আর রাতের শয্যায় অনুপম চক্রবর্তীও এই লাভের কথাই ভেবেছেন। দিন চার পাঁচেকের মধ্যে ফেরার কথা তাঁর, কিন্তু চিন্তামণি ঘোষাল মুখের কথা খসানো মাত্র আপিসে টেলিগ্রাম করে আর বাড়িতে চিঠি লিখে এখানে স্থিতির মেয়াদ আরো তিন চারদিন বাড়িয়েছেন। চিন্তামণি ঘোষাল মুখ ফুটে বললে হোটেল বদলাতেও অনুপম চক্রবর্তীর আপত্তি হতনা।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখ থেকে ভাইঝির প্রশংসার কথা কান পেতে শোনেন। উনি বলেন, মেয়েটা চালাক খুব, কিন্তু পড়াশুনায় তেমন মন নেই, বি. এ. পরীক্ষায় তো একরকম না পড়েই অনার্স পেয়েছে, অবশ্য বাংলা বলেই পেয়েছে—এখন এম. এ. পড়ছে, বলে এম. এ. পাশ করে চাকরি করে জ্যাঠামণির দেখাশুনা ও-ই করবে—ওর কথা শুনে ভাল লাগে আরার হাসিও পায়—বিয়ে-থা হয়ে গেলে কোথায় থাকবি তুই আর কোথায় থাকবে তোর জ্যাঠামণি কে জানে।

অনুপম চক্রবর্তী কখনো আড় চোখে কখনো বা সোজাসুজি দেখেন শ্রীলেখাকে। নিজের চোখ ছেড়ে মনে মনে মায়ের চোখ দিয়ে দেখেন, ভাইদের চোখ দিয়ে দেখেন আর ভাবেন তাদের কেমন লাগবে। তাঁর বদ্ধ বিশ্বাস মায়ের ভাল লাগবে, ভাইদেরও ভাল লাগবে। রূপসী কিছু নয়, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর, স্বাস্থ্য ভাল, আর এই মেয়ের বুকভরা দরদের কথা শুনলে তাদের নিশ্চয় সব থেকে বেশি ভাল লাগবে। অনুপমবাবুর চোখে এটুকুই সব থেকে দুর্লভ সৌন্দর্য।

তাঁর অন্তরঙ্গ আচরণে; বিশেষ করে মাঝে মাঝে ও-রকম বিহ্বল চোখে চেয়ে থাকতে দেখে শ্রীলেখা অনেক সময় বিব্রত বোধ করেছে। সকালে এসে বেড়াতে যাবার জন্যে টানাটানি করবে, বেলা দশটা না বাজতে স্নানের জন্য। সমুদ্রে স্নান করতে শ্রীলেখার বিষম লজ্জা, মা গো, বিচ্ছিরি ঢেউয়ের যে কাণ্ড হয়! নিজে স্নান না করুক, স্নান দেখার জন্যেও জ্যাঠামণিকে আর ওকে নিয়ে টানাটানি। তারপর বিকেলে বেড়ানো তো আছেই—রাত আটটার আগে বীচ ছেড়ে আসতেই চায় না, বলে, এই হাওয়ায় জ্যাঠামণির উপকার হবে, বসুন না। রওনা হবার আগের দিন কিছু না জিজ্ঞেস করেই সকলের জন্য বাসে উদয়গিরি খণ্ডগিরি আর কোণারক বেড়িয়ে আসার টিকিট কেটে বসলেন। খুব ভোরে রওনা হয়ে সন্ধ্যায়

ফেরা। সেদিন নাজেহাল অবস্থা শ্রীলেখার। জ্যাঠামণির পাহাড়ে ওঠার সাধ্য নেই, তিনি নীচে বসে। ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রথমে ছোট উদয়গিরিতে ওঠাটা সহজেই হয়ে গেল। নেমেই আবার খণ্ডগিরিতে ওঠার তাড়া। এটা অপেক্ষাকৃত উঁচু, আর বেখাপ্পা রকমের খণ্ড খণ্ড ভাগ করা। শ্রীলেখার দম শেষ। ভদ্রলোক অনায়াসে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, আব একটু বাদে বললেন, এরকম সুযোগ কোন সভ্যভব্য পুরুষ ভদ্রলোকেরও ছাড়তে নেই।

শ্রীলেখা লজ্জা পেয়েছে, খারাপও লাগেনি, কেবল মনে হয়েছে একটা অধ্যায় বড় অস্বাভাবিক দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ভদ্রলোকেব পাশে ঘুরে ঘুবে কোণারকেব সূর্যমন্দির দেখতে গিয়ে তো সমস্ত মুখ টকটকে লাল শ্রীলেখার। এমন সব চিত্র খোদাই করা রয়েছে যে চোখ তুলে তাকাতে গেলেও বুক ঢিপ ঢিপ করে আব কান গরম হয়ে যায়। অথচ ভদ্রলোক গম্ভীর মনোযোগে দেখে যাচ্ছেন, আর এক এক বার ওব দিকে তাকাচ্ছেনও। মনে মনে এক নম্বরের অসভ্য ছাড়া আর কি বলবে শ্রীলেখা?

দেখা শেষ হতে যেন ঘাম দিযে জ্বর ছেড়েছে। কিন্তু বাসের মধ্যে অস্বস্তি, সারাক্ষণের মধ্যে কতবার যে ভদ্রলোকের নিবিষ্ট দৃষ্টি তার মুখের ওপর সংবদ্ধ দেখছে ঠিক নেই।

হ্যাঁ, যা আশা করেছিলেন অনুপম চক্রবর্তী তাব থেকে ঢের বেশি খুশির আলো দেখেছেন মায়ের মুখে। আর ভাইদের যে কত পছন্দ হয়েছে সেও যেন ওদের চোখে মুখে লেখা।

কলকাতায় ফেরার তিন মাসেব মধ্যে শ্রীলেখাকে ঘরে এনেছেন।

তারপর আনন্দের হাট বাড়িতে। দু'দিন না যেতে অজুটা তো তাঁর সামনেই বউয়ের হাত ধরে ঘোমটা টেনে খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাহলে সেই মেয়ে যে মাকে আমাকে আর অমুকে খরচের খাতায় লিখে দেবে না?

সপ্রতিভ মুখে শ্রীলেখা জিজ্ঞাসা করেছে, সেটা কি ব্যাপার?

কি ব্যাপার আমরাও জানি না, কিন্তু এই ব্যাপারের ভয়ে দাদার এতকাল বিয়েতেই আপত্তি ছিল।

আরো দিনকতক না যেতে দুজনে হুড়োহুড়ি হাতাহাতি। অনুপমবাবু হাসেন, মা মেজছেলের উদ্দেশ্যে তেড়ে আসেন, লেগে যাবে যে হতচ্ছাড়া!

অজু বলে আমার সঙ্গে লাগতে আসে কেন?

শ্রীলেখা প্রতিবাদ করে, আমি লাগতে এলাম!

তুমি আমার নাম ধরে ডাকনি?

ছোটকে নাম ধরে ডাকব তাতে কি?

ছোট! সেদিন হিসেব হল আমি এগারো দিনের বড়, ঠিক আছে, দুজনেই দুজনকে নাম ধরে ডাকব।

তাহলে কানের দিকে আমার হাত যাবেই, আমি অনেক বড়।

ইস অনেক বড়, ধাড়ী মেয়ে আমার এক বছর নীচে পড় সে-খেয়াল আছে?

শ্রীলেখা জবাব দেয়, সেই লজ্জাতেই তো পড়া ছাড়লুম।

অনুপম বাবুর চোখ জুড়োয়, কান জুড়োয়। অমু চার বছরের ছোট ওদের থেকে, সে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। বৌদিকে য়ুনিভার্সিটিতে ঢোকানোর জন্য অজু দিনকতক আদা জল খেয়ে লেগেছিল। অনুপম বাবুরও ইচ্ছে ছিল এম. এ-টা পাশ করুক। কিন্তু শ্রীলেখার ভালই লগে না। কিছু বলতে গেলে উল্টে ভয়

দেখায়, পড়াশুনা করতে হলে আমার ঘর আলাদা করে দাও, রাত জেগে পড়তে হবে, আর তুমি সন্ধ্যার পর থেকে সে ঘরে ঢুকতে পাবে না।

অনুপমবাবু সভয়ে হাল ছাড়েন, কি সর্বনাশ, থাক থাক--

...অনুভূতিপ্রবণ মানুষটার রাতের তৃষ্ণার একটা প্রবল দিক টের পেয়েছে শ্রীলেখা। এটাই এক এক সময় অস্বাভাবিক মনে হয় তার, ধকলও কম পোহাতে হয় না। পাঁচ দিনের জন্য জ্যাঠামণির কাছে গেলেও ছ'দিন না যেতে সেখানে গিয়ে হাজির হবে। কারো ঠাট্টা ঠিসারা গায়ে মাখার মানুষ, নয় আর শ্রীলেখা কিছু বললে পাল্টা ঝাঁঝ, থাকতে না পারলে কি করব!

দেড় বছর না যেতে সংসার আরো ভরাট হয়েছে। নয়ন, নাম্নু এসেছে। ওই নাম তার দিদিমার দেওয়া। নাতিকে আদর করে বলতেন, তুই হে চোখের মণি, এ নয়ন না দেখলে আমার নয়ন অন্ধ। আড়ালে অনুপম চক্রবর্তী লেখাকে ধরে খুনসুটি করেন, মায়ের আনন্দ দেখে মনে হচ্ছে আর দু'চারটে নাতি পেলে আরো খুশি হন।

শ্রীলেখা রেগে গিয়ে চোখ পাকায়, খবরদার, তুমি কথা দিয়েছে অন্তত সাত বছরের গ্যাপ—

কতটা গ্যাপ?

শ্রীলেখা রাগতে গিয়ে হেসে ফেলেছে, অশ্লীল গল্প লেখ না বটে কিন্তু তোমার মুখ অশ্লীল হয়ে গেছে।

না, এদিক থেকে বেপরোয়া নন মানুষটা, রাতের তৃষ্ণার তারতম্য ঘটেনি, কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। দারিদ্র্যের স্বরূপ জানেন, ওই একটা ছেলেকেই মনের মত গড়ে তোলার সঙ্কল্প।

এম. এসসি. পাশ করে অজিতেশ বছর দুই পর্যন্ত এক একটা

চাকবি ধরল আর ছাড়ল। অ্যাপ্রেন্টিস কেমিস্ট, কলেজের ডিমেন্সট্রেটর, শেষে স্কুল মাস্টার। এ. এসসি-র ফল খারাপ হবাব ফল ভোগ করছে সে। মন মেজাজ সর্বদাই খারাপ তার, দাদার চেয়ে নিজেরও কম উচ্চাশা ছিল না, অথচ এ কি বরাত তার। স্কুল মাষ্টারিতে ঢুকে দিবারাত্রি গাত্রদাহ।

দাদা আগেও বলেছেন, পরেও বললেন, আমাব কথা শুনে মন দিয়ে একটু পড়াশুনা কবে কমপিটিটিভ পরীক্ষায় বোস্, একটা কিছু হবেই—এ বছরটা গেল ইচ্ছে থাকলেও তো আব পরীক্ষা দিতে পারবি না।

বয়েসের সার্টিফিকেট অনুযায়ী কমপিটিটিভ পবীক্ষায় বসাব সেটাই শেষ বছর। দাদার কথায় আর মায়ের তাগিদে অজিতেশ 'আদা জল খেয়ে লেগে গেল। কিন্তু কি পরীক্ষা দিচ্ছে একমাত্র সে ছাড়া ফল বেরুনোর আগে পর্যন্ত কেউ জানল না। ফল বেরুতে জানা গেল, পুলিশ লাইনেব এক সামান্য চাকরিব পরীক্ষা দিয়েছে সে আর পরীক্ষায় খুব ভালই পাস করেছে। কয়েকজন সঙ্গী সাথীর পরামর্শে সে এই কাজ করেছে, এবং খোঁজখবর নিয়ে সেই পরামর্শের সুনজীরও দেখেছে। এম. এসসি. পাস ছেলে এই লাইনে যোগ্যতা দেখাতে পারলে টপাটপ উন্নতি। কারণ ইউনিভার্সিটির ছাকা বাছা ছেলেরা এদিকে বড় একটা ভিড় করে না।

অনুপম চক্রবর্তী আকাশে থেকেই পড়েছেন, পুলিশের চাকরি।

ভাই জবাব দিয়েছে, আমরা এদিকে না এলে এদিকটা ভাল হবে কি কবে? বিদেশের কত ভাল ভাল ছেলে সব ছেড়ে এ লাইনটাই বেছে নেয়।

কথাগুলো অযৌক্তিক মনে হয়নি অনুপম চক্রবর্তীর। কিন্তু ভিতরটা খুঁতখুঁত করেছে

শ্রীলেখা দেওরকে ঠাট্টা করছে, শেষে কিনা এই !

অজিতেশ জবাব দিয়েছে, পুরীর বীচে ছেলেরা যখন ছিঁড়ে খেতে চেয়েছিল, দাদাকে তখন পুলিসের দরজার দৌড়তে হয়নি ?

এবারে অজিতেশের বিবেচনায় ভুল হয় নি। শুরু থেকেই এম. এসসি. পাশ ছেলেব যোগ্যতা অনেকেব চোখে পড়েছে। চাকবিতে ঢোকাব আড়াই বছবেব মধ্যে পদোন্নতি হয়েছে, আব চাব বছরের মধ্যে দ্বিতীয় দফা উন্নতিব ফলে বাড়ি ছেড়ে তাকে আবাসিক কর্মক্ষেত্রে যেতে হয়েছে।

ছোট ভাই অমিয় তখন বিলেতে। তার বেলায় অনুপম চক্রবর্তী কোন অনিশ্চয়তাব মধ্যে থাকতে চাননি। ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এঞ্জিনিয়াবিং পাস কবাব পবেই ওকে বিলেত পাঠাবাব তোড়জোড় করেছেন। মামীব দেওয়া টাকাব অর্ধেকের বেশি ততদিনে নিঃশেষ, বাকি যা আছে তাবই ওপর নির্ভর করে ছোট ভাইকে একরকম জোর করেই বাইরে পাঠিয়েছেন।

দু'ভাইকে লক্ষ্য করেই মা সেদিন বলেছিলেন, ও তোদের জন্য কি করল তোবা শুধু মনে রাখিস, ভুলিস না।

···কিন্তু বিলেতেব খবচ চালাবাব হিসেবে ভুল হয়ে থাকবে অনুপম চক্রবর্তীর। শেষের মাথায় হাজাব চারেক টাকা ঘাটতিই পড়ে গেল। অনুপম চক্রবর্তী তখন প্রকাশকের কাছে ঘোরাঘুরি করে সে-টাকা তোলার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু শ্রীলেখা তাতে বাদ সেধেছে। জোর করেই তার গয়নার বেশির ভাগ বিক্রি করে ছেড়েছেন। মা শুনে নির্বাক খানিকক্ষণ, তারপর শুধু বলেছে, তোরা দুজনেই কি এক রকম !

অজিতেশ শুনে রাগারাগি করেছে। টাকা এনে দিতে চেয়েছে।

দাদা সস্নেহে ধমক দিয়েছেন, ক'দিনের চাকরি তোর ? টাকা হাতে রাখ, পরে দেখিস কত ভাবে দরকার হবে। পরে হেসে বলেছেন, তোরাই তো গয়না রে আমাদের।

॥ পাঁচ ॥

শুক্লা বাগচী। থিয়েটারের মাঝারি প্রতিভার এক অভিনেত্রী সুষমা বাগচীর মেয়ে শুক্লা বাগচী। এই মেয়েকে নিয়েই নিরুপদ্রব সংসারে আচমকা এক সংকট উপস্থিত।

এর প্রায় ছ'সাত মাস আগে শ্রীলেখা, অনুপমবাবুর কানে অজুর বিয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। বলেছিলেন, নিজে তো দিব্বি আছ, ভাইদের বিয়ে দিয়ে-টিয়ে দেবে না ?

অনুপমবাবুর তখনই খেয়াল হয়েছে তার একটা সমূহ কর্তব্য উপস্থিত। সোৎসাহে মায়ের কানে কথাটা তুলেছেন তিনি। মা বলেছেন, সময় তো হয়েছে, দেখে শুনে বিয়ে দে !

সন্ধ্যায় বাড়ি আসাটা অজিতেশের নৈমিত্তিক কর্তব্য। দুই একদিন বাদ পড়ে গেলে মায়ের থেকেও দাদা বেশি ব্যস্ত হন। সেদিন আসা মাত্র দাদার কর্তব্য করতে গিয়ে অনুপম চক্রবর্তী অবাক একটু। বিয়ের কথা তুলতে অজু কানে না তুলেই পাশ কাটাতে চেয়েছে।—হ্যাঃ এখন বিয়ে, তুমি এসবে এখন মাথা দিও না।

দেব না মানে, সাতাশ পার হয়ে গেল আর কবে করবি?

সে পরে ভাবা যাবে, এখন না। সেই সন্ধ্যায় বেশিক্ষণ বসলই না আর। তারপর যখনই কথাটা তোলা হয়েছে ওই এক জবাব। কানই দিতে চায় না। অনুপম বাবুর এমনও মনে হয়েছে বিয়ের কথা তুললে ভাই মনে একটু বিরক্তই হয় ভিতরে ভিতরে। শেষে স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা করেছেন, কি ব্যাপার বল তো, কোথাও ফেঁসে টেঁসে গেল নাকি!

শ্রীলেখার জবাব আরো ভাবিয়ে তুলেছে তাঁকে! তাকে নাকি অজু বলে গেছে, সকলে মিলে এভাবে বিয়ের তাগিদ দিলে এখানে আর আসাই হবে না।

এর মাস ছয় বাদে শ্রীলেখা একদিন চিন্তিত মুখে বলল, তুমি যা ভেবেছ তাই বোধহয় ঠিক, বাড়িতে কিছু না বলে তুমি অজুর সঙ্গে একবার ওর ওখানে গিয়ে দেখা কর।

কেন বল তো?

যা শুনলেন তাতে তাঁরও চিন্তার কারণ ঘটল। অজু নাকি সেদিন তার বউদিকে বলেছে, বিয়ে বিয়ে যে করছ, যদি কোথাও বিয়ে করতে চাই দাদা নিজে দাঁড়িয়ে সেখানে বিয়ে দেবে?

শ্রীলেখা তক্ষুনি চড়াও হয়েছে তার ওপর। বলেছে, দেবে না কেন, তোমার দাদা নিজেই তো পথ দেখিয়ে রেখেছে, কি ব্যাপার বল—

অজু ঠাট্টা করেছে, আমার দাদা দেবীর সাক্ষাত পেয়েছিল তাতে কার কি আপত্তি হবে? তুমি এসেছ, সকলে ভাগ্যি ভেবেছে।

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করেছে, তোমার বেলাতেই বা ভাববে না কেন, তুমি কার সাক্ষাত পেয়েছ?

অজু আব জবাব দেয়নি, পালিয়েছে। শ্রীলেখা তাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে, বার বার করে দাদার সঙ্গে দেখা করে যাবার কথা বলেছে, কিন্তু ওর পালাবার তাড়াই যেন বেশি, যেতে যেতে মাথা নেড়ে বলে গেছে, না, এখানে কোন কথা হতে পাবে না।

অনুপমবাবু পরদিনই সন্ধ্যায় ভাইয়েব কোয়ার্টাস-এ ছুটেছেন। যাচ্ছেন আগেই টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছিলেন। তার মুখ দেখেই মনে হল শ্রীলেখা যা বলেছে আর সন্দেহ করেছে তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। অজু মুখ তুলে ভাল করে তাকাতেও পারছে না তার দিকে।

তুই একটা গাধা নাকি রে! কোন্ মেয়েকে পছন্দ করেছিস, এতদিন বলিসনি কেন?

অজু জবাব দিল, বললে তোমরা আনন্দে আটখানা হবে না।

অনুপম চক্রবর্তী ঘাবড়েই গেলেন, কেন, বামুন তো না কি?··· মায়ের কথা ভেবে জিজ্ঞেস করছি?

ব্রাহ্মণই···সে-সব ঠিক আছে।

তাহলে? তাহলে আর কি?

আর কি জেরা করে করে সেই বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছেন। পরে আর জেরাও করতে হয়নি, খানিকটা বার করে নেবার পর অজিতেশ নিজের আগ্রহেই সবটা বলেছে। শুনতে শুনতে অনুপম চক্রবর্তীর মুখ গম্ভীর, ভিতরটা বিমর্ষ।

···মেয়ের নাম শুক্লা বাগচী। তার মায়ের নাম সুষমা বাগচী।

মহিলা থিয়েটারে অভিনয় করতেন, পয়সার জন্য বয়স্কার রোলে ডাক পড়লে কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্টেজে নেমেছেন। আট-ন' মাস হল থিয়েটারের সংশ্রব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। সুষমা বাগচীর স্বামী চাকরি ছেড়ে ফিল্ম আর্টিস্ট হয়েছিল। অভিনয়ের থেকে চেহারাটাই তাঁর বড় সম্বল ছিল। এত ভাল চেহারা সচরাচর দেখা যায় না। তিন বছরের মেয়ে আর স্ত্রীকে ফেলে সেই লোক একদিন এক মস্ত বড়লোকের মেয়েকে নিয়ে উধাও। আর ফেরেননি। ভদ্রলোক বেঁচে আছেন কিনা আজও কেউ জানে না।

মেয়ে নিয়ে পথে দাঁড়ানোর উপক্রম হয়েছিল সুষমা বাগচীর। পাড়ায় মোটামুটি নামী থিয়েটার ক্লাব ছিল একটা। তার পরিচালক স্বামীর বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুটি সুষমা বাগচীকে ছোটখাটো কিছু কিছু পার্ট দিয়ে অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। নিজের চেষ্টায় সুষমা বাগচী অভিনয় রপ্ত করে ওপরের দিকে উঠেছেন। নিজেদের ক্লাব ছাড়া বাইরের শৌখিন নাট্যসংস্থা থেকেও ক্রমে তাঁর ডাক এসেছে। শেষে পেশাদার মঞ্চ থেকেও। সেখানেও তিনি দীর্ঘকাল বাঁধা মাইনের শিল্পী ছিলেন।

তাঁর মেয়েটি সুন্দরী, বাপের চেহারার আদল পেয়েছে। সেই জন্যে মেয়ের সম্পর্কে মায়ের সর্বদা একটা অহেতুক ভয় ছিল। একটা বিশ্বস্ত বয়স্ক পুরণো চাকর তাকে আগলে রাখত। মেয়েকে যত্ন করে লেখা-পড়া শেখাচ্ছিলেন সুষমা বাগচী। সর্বদা কড়া শাসনে রাখতে চেষ্টা করতেন। থিয়েটার দেখতে দিতেন না, সিনেমা দেখতে হলে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। ফাঁক পেলে অবশ্য মেয়ে মাকে লুকিয়ে সিনেমা থিয়েটার দুইই দেখত।

···গেল বছর শুক্লা বাগচী বি. এ. পড়ছিল। তখন থেকেই এই মেয়ে নিয়ে ঝামেলা শুরু। অনেক রকমের ছেলে বাড়ির কাছে

ঘুরঘুর করত। তাদের মধ্যে এক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ক্রমে বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল। আগে চিঠি-চাপাটি ছেড়েছে, মেয়ের নামে তো বটেই, তার মায়ের নামেও। শুক্লা বাগচীকে সে বিয়ে করে রাণীর হালে রাখবে।

সুষমা বাগচী জানতেন ছেলেটা দুশ্চরিত্র। তাঁর জীবনের একমাত্র আকাংখা লেখা-পড়া শিখিয়ে মেয়েকে সুপাত্রস্থ করবেন। নিজের মত মেয়ের জীবনটা যেন বিষিয়ে না যায়। চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছেন আর রাগে জ্বলেছেন। শেষে বাড়িতে একদিন পাড়ার কয়েকটি নাম-করা মস্তান এসে উপস্থিত। সুষমা বাগচীর সঙ্গে দেখা করে তারা জানিয়ে গেল অমুক ছেলের সঙ্গে অর্থাৎ সেই অবস্থাপন্ন ঘরের দুশ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় বিপদ হবে।

চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন সুষমা বাগচী। এই ছেলে-গুলোর হুমকির দর জানেন। অনেক রকমের অঘটন ওরা অনায়াসে ঘটিয়ে থাকে। নিরুপায় হয়ে শেষে থিয়েটারের মালিক প্রিয়নাথ চৌধুরীর শরণাপন্ন হলেন তিনি। ভদ্রলোকের সঙ্গে দীর্ঘকালের যোগ তাঁর। বছর পঞ্চাশেক হবে বয়েস। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসেন, ইদানীং একটু বেশিই আসছিলেন। শুক্লাকে বিশেষ স্নেহ করেন, ছোটবেলা থেকে দেখে আসছেন তাকে।

বিশেষ প্রয়োজন আছে জানিয়ে তাঁকে বাড়িতে আসতে বলেছিলেন সুষমা বাগচী। সব শুনে গম্ভীর তিনি। তারপর খুব স্পষ্ট করে যে কথা বললেন মহিলার কানে সেটা একেবারে দুর্বোধ ঠেকল। প্রিয়নাথ চৌধুরী বললেন, কিছুদিন ধরেই তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম, এ-রকম যখন বিপদ বলে ফেলাই ভাল। মেয়ের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও

…তাতে ওর তো ভাল হবেই তোমারও ভাল হবে।

শুনে মহিলার আচমকা খটকা লাগল একটা। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে বলছেন ?

প্রিয়নাথ চৌধুরী এবারে আরো স্পষ্ট করে বললেন, তোমার মেয়েটিকে আমার অনেকদিন থেকেই পছন্দ, ওকে আমি ভিন্ন মতে বিয়ে করব, ওকে একটা আলাদা বাড়ি দেব, যাবজ্জীবন ভরণপোষণের টাকা ওর নামে ব্যাঙ্কে জমা করে দেব, ও সুখে থাকবে, তুমিও নিশ্চিন্ত হবে আর সুখে থাকবে।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন সুষমা বাগচী, বলে উঠেছিলেন, আপনি বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে—এক্ষুনি বেরিয়ে যান বলছি ! আপনার ছেলেমেয়ের থেকেও বয়েসে ছোট ও, আপনার লজ্জা করে না !

প্রিয়নাথ চৌধুরী হাসি মুখে উঠে গেছেন, বলে গেছেন, আব একদিন পায়ে ধরে তোমাকে এ প্রস্তাবে রাজি হতে হবে, এই বলে গেলাম—

সেই দিনই প্রথম শুক্লা মাকে জানাল লোকটা কত বড় পাজি। কিছুদিন হল কাছে ডেকে আদর করার নামে ওর গায়ে বিচ্ছিরি ভাবে হাত দিতে শুরু করেছিল। তারপর দিনকতক হল বিয়ের প্রস্তাব করেছে। বাংলা দেশের সব থেকে বড় আর্টিস্ট বানিয়ে দেবে ওকে সেই লোভও দেখিয়েছে। তাছাড়া সমস্ত জীবন তো সুখের পালঙ্কে শুয়ে কেটে যাবেই। ভয়ে এমন সিঁটিয়ে গেছিল সে যে মাকেও বলতে পারেনি। ওদিকে রাস্তায় ওকে ধরে সেই ছেলেগুলোও শাসিয়েছে, আর তারা অপেক্ষা করবে না, তার মায়ের জবাব চাই।

এর দিন পনেরোর মধ্যে একটা মারাত্মক খবর বেরুল থিয়েটারের মালিক প্রিয়নাথ চৌধুরী খুন হয়েছেন। মদ খেয়ে রাতে আর

বাড়িতে না ফিরে হলের দোতলায় তাঁর নিজস্ব ঘরে ঘুমুচ্ছিলেন, সকালে তাঁকে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত দেখা যায়।

এখানে অজিতেশের পদার্পণ। তদন্তের ভার তার ওপর। এ খুন অন্ধকারেই চাপা পড়ে যেত। গেল না একটা উড়ো টেলিফোনের খবর পেয়ে। খবর অনুযায়ী কয়েকটা ছেলেকে সে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদের ধরে ভাল রকম নাড়া-চাড়া দিতেই অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ল। ওই মস্তানদেব ডেকে প্রিয়নাথ চৌধুবী কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন আব জানিয়েছিলেন শুক্লা বাগচি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, প্রয়োজনে সেটা গোপন আছে, তবে তারা যেন এদিকে মাথা না গলায়।

এর পরেই শুক্লা বাগচী তাদের জানিয়েছে, ওই বড়লোকের ছেলেটিকেই সে বিয়ে করতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রিয়নাথ চৌধুরী তার আর তার মায়ের জীবন দুঃসহ করে তুলেছে, ভবিষ্যতে আরো বিপদের ভয় দেখিয়েছে, অতএব তার সঙ্গে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হবে না।

শুক্লা বাগচীর বাসনা অনুযায়ী সেই ফয়সালাই করা হয়েছে।

শুক্লা বাগচীকে অ্যারেস্ট করে এনেছে অজিতেশ। সুষমা বাগচী কেঁদে ভাসিয়ে বলেছে সব মিথ্যে, শুক্লা বাগচীও তাই বলেছে। মেয়েটাকে আর তার মাকে দেখে আর তাদের মুখে সমস্ত কথা শুনে অজিতেশের খটকা লেগেছিল। তাদের দোষী মনে হয়নি। তারপর হঠাৎ সন্দেহ বশে সে ওদের বয়স্ক চাকরটাকে ধরে আনল। কারণ উড়ো টেলিফোনে পুরুষের গলা পেয়েছিল। শেষে দেখা গেল সমস্ত ঘটনার কলকাঠি সে-ই ঘুরিয়েছে। নিজের বুদ্ধিতে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চেয়েছিল সে! প্রথমে ওই ছেলেদের কাছে শুক্লার নাম করে প্রিয়নাথ চৌধুরীর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছে ওদের।

সে খুন হতে আবার ওদের নামেই পুলিসের কাছে ফোন করেছে।

...প্রথম দিন দেখেই সেই মেয়েকে, শুক্লা বাগচীকে ভাল লেগেছিল অজিতেশের। তার মায়ের দুঃখের জীবনের কথা শুনে আরো ভাল লেগেছিল। নিজে চেষ্টা করে তাদের বিপদের জট ছাড়িয়ে দিয়েছে। কর্মস্থলেও সুনাম পেয়েছে এই জন্যে। দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয় জেনেও একটা অদ্ভুত আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে গেছে। ওদিকে তাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। ঝামেলা মিটে যাবার পরেও অজিতেশ সেখানে না গিয়ে পারেনি। তখন থেকেই হৃদ্যতার সূত্রপাত। দুর্বলতাব ঝোঁকে অজিতেশ নিজেই একদিন তার মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে বসেছে। শুক্লার মা এর আগেই তাদের সংসারের সমস্ত খবরাখবর খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলেন। মেয়ের মন বুঝে তিনি খুশি হয়ে মত দিয়েছেন। সাগ্রহে মত দেবার আরো কারণ, জীবন ভোর ভুগে মা মেয়ে দুজনেবই মনে হয়েছে, এ-রকম শক্ত হাতে পড়লেই তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। শক্ত হাতে অর্থাৎ পুলিস অফিসাবের হাতে। তাদের মত পাবার পরেই অজিতেশ বাস্তব সমস্যার কথা ভেবেছে। তাদের জানিয়েছে বিয়ে এখন হবে না, কিছু সময় লাগবে—সব কিছুই দাদার ওপর নির্ভর করছে, তিনি মত না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।... সাত আট মাস কেটে গেছে, এখন তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন অনুপমবাবু। আমার ওপর সব নির্ভর করছে না অজু, মা আছেন, সব তাঁর ওপর নির্ভর করছে। তাঁকে না জানিয়ে এতটা এগিয়ে ভাল করিসনি।

বাড়ি এসে মাকে আদ্যোপান্ত বলে তাঁর মতামত চেয়েছেন অনুপমবাবু। স্তব্ধ কঠিন মূর্তি তাঁর। জবাব দিয়েছেন, তুই কি করবি ভেবে দেখ, আমার মত নেই।

পরদিন আবার এসে ভাইকে জানিয়েছেন, মায়ের মত হল না তো।

অজিতেশ বলল, মায়ের মত হবে না জানতুম, আমি তোমার ওপর ভরসা করেছিলাম—

অনুপমবাবু জবাব দিয়েছেন, ভুল করেছিলি, মা থাকতে আমি কেউ না।

অসহিষ্ণু ক্ষোভে অজিতেশ ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

দিন পনের একটা অশান্তির মধ্যে কাটালেন অনুপম চক্রবর্তী। শ্রীলেখা বলে, তুমি দিন-রাত অত চিন্তা করে কি করবে?

সত্যিই সমস্ত কাজ পণ্ড হবার উপক্রম অনুপমবাবুর। পনের দিনের মাথায় হঠাৎ একটা ছোট চিঠি পেলেন তিনি।—'আমার সাধ্য থাকলে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। আমি এবং আমার মেয়ে শুক্লা আপনার ভাইয়ের পরিচিত। বিশেষ প্রয়োজনে এই চিঠি লিখছি, একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। শুনেছি, আপনি মহানুভব, তাই আশা আপনার দেখা পাব। শুভার্থিনী, সুষমা বাগচী।'

কাউকে কিছু না জানিয়ে অনুপম চক্রবর্তী আপিস থেকে সেই বিকেলেই চিঠির ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত। সুষমা বাগচী সবিনয়ে বসতে দিলেন তাঁকে, চিঠি পেয়েই এসেছেন বলে কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর ভনিতা না করে শান্ত মুখে বললেন, আপনার ভাই আপনাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করেন, তাঁর কাছ থেকে শুনে আপনার প্রতি আমাদেরও সেই শ্রদ্ধা।···আমি আজীবন দুঃখী, আমার একমাত্র আশার সম্বল, মেয়ে ভাল ঘর পাবে। মেয়েও ভাল ঘরের স্বপ্নই দেখে এসেছে। এ কি আমাদের খুব দুরাশা?

অনুপমবাবু বলেছেন, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, আমার মা আছেন···

তিনি সুখে থাকুন। কিন্তু আপনার ভাই আমাদের ভরসা দিয়েছিল, আপনি আছেন। সময়ে আপনার মত হবে।

ওকে আমি বলেছি সেইখানে ও ভুল করেছে। মা-ই সব··· তবু আমি দেখি, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন।

একটু ইতস্তত করে মহিলা শেষে মৃদু অথচ স্পষ্ট করেই বলে ফেললেন, আপনার মত একদিন হবে সেই আশায় অপেক্ষা করেই ছিলাম···কিন্তু সেই দুর্দিনেও যা হয়নি, হতভাগীর সেই ক্ষতি হয়ে গেছে···আমি নিজের ভাগ্য ছাড়া আর কারো দোষ দিচ্ছি না··· আপনি বিচক্ষণ, এ অবস্থায় কতটা অপেক্ষা করা চলে আপনিই বিবেচনা করবেন।

অনুপম চক্রবর্তী বিমূঢ় নেত্রে চেয়েছিলেন খানিক। তার পরেই কান-মাথা তপ্ত। সামলে নিলেন। অনেকক্ষণ বাদে উঠে দাঁড়ালেন, ঠিক আছে মা···কিন্তু আমার বোনটিকে একবার দেখে যাব।

এই রকম করে বলতে পেরেছিলেন বলেই মা ব্যস্তসমস্ত। মেয়ে যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই টেনে নিয়ে এলেন!—প্রণাম কর, আজ তোর কত ভাগ্যি!

শুক্লা প্রণাম করল। দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে গেল অনুপম চক্রবর্তীর। হঠাৎ সমস্ত সমস্যাই যেন বিস্মৃত হলেন তিনি। শুক্লার মাথায় একখানা হাত রেখে একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, বাঃ, খাসা দিদি আমার ··ভাইকে তো পছন্দ হয়েছে, ভাসুর পছন্দ হবে তো?

ভয় কাটিয়ে শুক্লা মুখের দিকে তাকাতে পেরেছে, হাসতেও পেরেছে একটু। সামান্য মাথা নেড়েছে, পছন্দ হয়েছে।

বাড়ি ফিরে রাত্রিতে মায়ের কাছে এসে বসেছেন অনুপমবাবু। সাদা সাপটা প্রশ্ন, মা আমাকে তুমি বিশ্বাস কর?

মা অবাক।—তোকে বিশ্বাস করি না তো কাকে করি?

আমার ওপর তুমি নির্ভর করতে পারো ?

কি বলবি বল্ না !

অজু যেখানে বিয়ে করতে চায় সেখানে বিয়ে দাও। মেয়েটিকে আজ আমি দেখে এসেছি, ভাল মেয়ে, আর তোমার বড় বউয়ের থেকে ঢের ঢের সুন্দরী। ...আমরা নিজেরা দাঁড়িয়ে বিয়ে না দিলে, একদিন না একদিন ওরা নিজেরাই বিয়ে করবে—আমি সেটা চাইনে।

মা তাঁর এই ছেলের মুখখানাই নিরীক্ষণ করলেন ভাল করে। তারপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন, তোব মত হয়ে থাকলে আমি আব কি বলব।

বিয়ে হয়ে গেল।

বাড়িতে যে অশান্তির ছায়াটা ঘন হয়ে উঠছিল, বিপরীত খুশির ঝলমলে আলোয় সেটা ডুবে গেল।

॥ ছয় ॥

এতদিন মা ছিল, তাই যেন সব ছিল অনুপম চক্রবর্তীর। আনন্দ ছিল সুখ শান্তি ছিল, ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ছিল। ওই মায়ের কাছ থেকে যতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিলেন, ততদিনই যেন এক মৃত্যু-ছোঁয়া মানসিকতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি।

মাত্র তিন-চারদিনের জ্বরে মা তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন। সেটা এত আকস্মিক যে অনুপম চক্রবর্তীর স্নায়ু অন্তত সেটাকে গ্রহণ করতে পারছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল এ কেমন করে হয়, সব যেখানে ভর-ভরতি তার মধ্যে মা নেই, এ কেমন করে হয়।

অথচ মা যখন চোখ বোঁজেন তখনও এ সংসারের আনন্দের প্রতিশ্রুতি উজ্জ্বল। অমু তার মাসকয়েক আগে বিলেত থেকে ফিরেছে, বড় চাকরি সঙ্গে করেই এনেছে। অবশ্য এক জায়গায় স্থিতি হতে পারছিল না, কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই করে বেড়াতে হচ্ছে। নান্নুকে নিয়ে লাফালাফি করেছে আর মাকে বলেছে, ও আর একটু বড় হলে ওকে বাইরে রেখে মানুষ করার ভার আমার, দাদা যদি আপত্তি করে তো ভাল হবে না বলে দিলাম।···অজু আর শুক্লা বলতে গেলে রোজই প্রায় আসত, ওদের হাসি-খুশি মুখ দেখতে পেলে অনুপম চক্রবর্তীর চোখ জুড়াত বুক জুড়াত। দাদার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই ওদের দুজনেরই। শুক্লা তো মাসের মধ্যে কতদিন এসে আর যেতেই চাইত না, মা আর জায়ের কাছে থেকে যেত।···এ ছাড়া নিশ্চিত সুসময়ের মুখ অনুপম চক্রবর্তী নিজেও দেখেছিলেন। মাস চারেক হল তাঁর প্রমোশন হয়েছে, প্রচার সচিব অবকাশ গ্রহণ করতে রঘুনাথ শাসমলের কলমের খোঁচায়, সহকারী প্রচার সচিব থেকে তিনিই অস্থায়ী প্রচার সচিব হয়ে বসেছেন। অস্থায়ী কারণ, স্থায়ী হবার কতকগুলো আনুষ্ঠানিক রীতি আছে। আগামী ছ'মাসের মধ্যে অর্থাৎ নতুন সেসন পড়লে পোস্ট অ্যাডভার্টাইজ করা হবে, চোখে ধুলো দেওয়া গোছের ইণ্টারভিউ হবে একটা, তারপর আনুষ্ঠানিক ভাবে স্থায়ী প্রচার সচিব যে তিনি হবেন তাতে কারো সংশয় নেই।

···সর্বদিক যখন ভরাট, মা চোখ বুঁজলেন।

আর তার তিন চার মাসের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিভ্রাটে সমস্ত সুখ স্বপ্ন বুঝি মিলিয়ে যেতে থাকল অনুপম চক্রবর্তীর চোখের সম্মুখ থেকে।

কিন্তু তলিয়ে চিন্তা করলে বিভ্রাটটা খুব অপ্রত্যাশিত নয়।

আর যে কেউ হলে সেটাকে নিজের উন্নতির সিঁড়ি হিসেবে কাজে লাগাত। অনুপম চক্রবর্তী সেটা পারলেন না বলেই সংকটের দিকে এগোতে লাগলেন।

সংঘাত বাধল ফার্মের প্রবল প্রতাপ কর্তাব্যক্তি রঘুনাথ শাসমলের সঙ্গে। এ ক'বছরে মানুষটার সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছিলেন তিনি, ভদ্রলোকের ভাল দিক যেমন, মন্দ দিকটাও তেমনি প্রখর। তার বিধি-ব্যবস্থায় নীতির বালাই বলে কিছু নেই, তিনি যা বলবেন তাই হবে, তাঁর হুকুমটাই আইন। অবশ্য বছর খানেক হল তাঁর আগের সে প্রতাপ অতটা নেই। কেউ স্বেচ্ছাচারী এক-নায়ক হয়ে উঠছে দেখলেই তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধও আপনা থেকেই গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে আপিসের ইউনিয়ান পিছনে লেগে তাঁকে অনেকখানি কোণঠাসা করেছে আর কিছু দুর্নামের ভাগীও করেছে। সরকারী সাহায্য পেলেও কাঁচা মাল কেনা আর তৈরি মাল বণ্টন করা—দুইই ফার্মের হাতে। সে-কাজটা বেশির ভাগই হত আর. এন. এস-এর হাত দিয়ে। অনুপম চক্রবর্তী গোড়া থেকেই শুনে এসেছিলেন এই খাতে ভদ্রলোকের পকেটে অবিশ্বাস্য রকমের মোটা টাকা আসে, আর সেই টাকার জোরেই ভদ্রলোক এমন বেপরোয়া স্বেচ্ছাচারী।···প্রায় দু'বছর হল এই ব্যাপার নিয়ে ইউনিয়ান তার পিছনে লেগেছিল। তাই বছরখানেক ধরে ওই কর্তৃত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়েছে। ফলে বেশ আর্থিক অনটন চলছে নাকি তাঁর।

···অনুপম চক্রবর্তীর প্রচার সচিব হয়ে বসার পর তাঁর অধীনে একটি মেয়ে নিযুক্ত হয়েছিল, তার নাম মীনা সাকসেনা। ইউ. পি-র মেয়ে, শিক্ষা দীক্ষা কলকাতায়। বাঙালী মেয়ের মতই বাংলা বলে। বছর চব্বিশ পঁচিশ হবে বয়েস। দেখায় আরো কম। অনুপম চক্রবর্তী প্রচার সচিব হবার ফলে, নীচের আর একজন

সহকারী সচিব হয়েছে, সেই লোকের শূন্য স্থানে মীনা সাকসেনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বলা বাহুল্য, তারও মুরুব্বি আর, এন, এস, অর্থাৎ রঘুনাথ শাসমল, আর সেই কারণে গোড়া থেকেই মেয়েটিকে সুনজরে দেখেনি কেউ। তার প্রধান কারণ, এই নিয়োগের ফলে তলার দিকের অনেকের প্রমোশন আটকে গেল, দ্বিতীয় কারণ, রঘুনাথ শাসমল যে মেয়ের মুরুব্বি, তার স্বভাব-চরিত্র নির্ভেজাল হতেই পারে না। এই নিয়োগ নিয়েও ইউনিয়ান শোরগোল তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন যেন সেটা বেশি দূর গড়ায়নি।

না, প্রথম কিছুদিন অন্তত অনুপম চক্রবর্তীও সুনজরে দেখেননি মেয়েটিকে। অন্য লোকের যে কারণ তাঁরও সেই একই কারণ। মেয়েটি সুতৎপর, রূপের থেকেও তার চোখে মুখে বুদ্ধির ছটা বেশি। স্বাস্থ্য। ঠোঁটে মৃদু হাসি লেগেই আছে, অথচ স্বল্পভাষিণী। এই গোছের মেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই পুরুষের চোখ টানে।

ডিপার্টমেন্টের লোকেরা কেউ সদয় নয় মীনা সাকসেনা সহজেই বুঝতে পারত। সে আসত যেত, সহযোগিতা দূরে থাক, উল্টে ওকে শুনিয়েই টিকা-টিপ্পনী কাটত অনেকে। মেয়েটির মুখ লাল হত, কিন্তু চুপ করেই থাকত।

সেই মীনা সাকসেনা একদিন ছুটির পর অনুপমবাবুর ঘরে এল। তার ব্যক্তিগত কিছু কথা আছে।

···সেই দিন থেকেই অনুপম চক্রবর্তী সদয় মেয়েটির ওপর। খুব স্পষ্ট অথচ নরম সুরে মীনা বলেছিল, আপিসের কেউ আমাকে পছন্দ করে না, আপনিও না,···কিন্তু আমি কি করব বলে দিন··· রঘুনাথ শাসমল কেমন মানুষ সে বিচার আমার নয়, এই চাকরি দিয়ে তিনি দুটি প্রাণীকে রক্ষা করেছেন, একজন আমি আর একজন আমার মা···আমার মা ক্যানসারে ভুগছেন, বাবা মারা যাবার পর

আমরা একেবারে চরম অবস্থায় এসে ঠেকেছিলাম।...এই চাকরি যদি আমি করি, হয়তো আমার মাকে বাঁচাতে পারব।

মাত্র দু'মাস আগে নিজের মা মারা গেছেন, এটুকু শুনেই অনুপম চক্রবর্তীর দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। এরপর আরো যা শুনলেন, স্তব্ধ তিনি।...মায়ের জন্য অনেক টাকা দরকার, তাই একজনের অনুগ্রহে ফিল্ম আর্টিস্ট হতে গেছিল, নীতি-দুর্নীতি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ওদের দারিদ্র্য আর দুরবস্থার সুযোগ নেবার জন্যে কত লোক তো হাঁ করেই আছে। কিন্তু সেখানে সুবিধে হল না, ফটোতে চেহারা তেমন আসে না—মাঝখান থেকে ক্ষতিই হয়ে গেল। এরপর চাকরি দেবার নাম করে একজন তিন মাস ঘুরিয়েছে, কিন্তু তারও মতলব ভাল না—শুধু ভাঁওতায় ভুলিয়েছে। অবশ্য সেই লোকের মারফতই রঘুনাথ শাসমলের সঙ্গে পরিচয় প্রথম—তাঁকে সব বলতে তিনি সরাসরি ওকে এখানে এনে বসিয়ে দিলেন। মৃত্যুর ছায়া সরে গেল, জীবনের তাপের মধ্যে এল ও। ওর মায়ের মুখেও বাঁচার আশার আলো দেখা গেল।

মীমা বলল, আমাকে কি আপনি একটু দয়ার চোখে দেখতে পারেন না ?

সেই থেকেই মেয়েটার প্রতি অনুপম চক্রবর্তী সহানুভূতিশীল। তাঁরই চেষ্টায় অন্য সকলের ব্যবহারও বদলে গেল। একদিন বাড়ি গিয়ে ওর মাকেও দেখে এলেন। শুধু অন্তরঙ্গ নয়, দেখতে দেখতে মেয়েটা যেন কেনা হয়ে গেল তাঁর। মেজাজ ভাল থাকলে আর. এন. এস-ও এই নিয়ে একটু আধটু ঠাট্টা করেন। মীনা সাকসেনা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—আই ডোণ্ট লাইক্ দিস মাচ্!

অনুপম চক্রবর্তী হাসতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তার কান গরম হয়।

ইদানীং মীনা প্রায়ই মনের কথা বলত তাঁর কাছে। বলত,

রঘুনাথ লোকটা আসলে পাজী আর মতলববাজ আর একেবারে দয়ামায়াশূন্য। তার জুলুম বাড়ছেই দিনকে দিন, মায়ের সেবার সময় পর্যন্ত বাড়ি গিয়ে হাজির আর জোর করেই ওকে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যায়।

ঘৃণায় ভিতরটা রি-রি করে ওঠে অনুপম চক্রবর্তীর, কিন্তু কি করবেন বা কি বলবেন ভেবে পান না।

এরপর হঠাৎ তিন দিনের জন্য রঘুনাথ শাসমল কোথায় চলে গেলেন। বলা নেই কওয়া নেই সেই তিন দিনের জন্য মীনাও ডুব অপিস থেকে। অন্য কর্মচারীরা মুখ টিপে হাসাহাসি করল। বস্‌কে ওই মেয়ের ওপর সদয় দেখে তারা সামনা-সামনি কিছু বলে না। চার দিনের দিন আর. এন. এস. আপিসে এলেন, মীনাও এল। শুকনো মুখ, চোখের কোণে কালি, মুখ দেখেই মনে হল এই তিন দিন মদ-টদও প্রচুর খেয়েছে।

অনুপম চক্রবর্তী সমস্ত অন্তরাত্মা বিমুখ তার প্রতি। সমস্ত দিন মীনাও সেটা অনুভব করল। বিকেলে তাঁর ঘরে এসে বসল।

মুখ না তুলেই অনুপম চক্রবর্তী বললেন, ব্যস্ত আছি, এখন যাও।

তবু বসে থাকতে দেখে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।···মীনা তাঁর দিকেই চেয়ে আছে, তার ছু'চোখ জ্বলছে। বলল, মায়ের অবস্থা খারাপ, আজ সকালেই তাঁকে হাসপাতালে দিয়েছি। তিন দিন আগে মাকে ফেলে যখন শাসমলের সঙ্গে চলে যাই তখনো মায়ের শরীর খারাপ ছিল।···কিন্তু সেই মাকে ফেলে আমাকে ওর সঙ্গে যেতে হয়েছিল, বুঝলে?···তুমি আমাকে যত খুশি ঘৃণা করতে পারো কিন্তু ওই পিশাচটাকে খুন করতে পারো? কেউ যদি ওকে খুন করে আমি চিরকাল তার বাঁদী হয়ে থাকতে পারি—বুঝলে?

দ্রুত ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল মীনা সাকসেনা।

'পরদিন। সর্বস্ব খোয়ানো সেই সংকটের দিন।

টিফিনের সময় রঘুনাথ শাসমলের ঘরে ডাক পড়ল অনুপম চক্রবর্তীর। ভিতরটা বিমুখ, তবু যেতে হল।

রঘুনাথ শাসমলের হাসি হাসি মুখ। হেসে আপ্যায়ণ জানালেন, এস, বস, তুমি তো আজকাল কাজের লোক হয়েছ, না ডাকলে আস না।

অনুপম চক্রবর্তী নীরব জিজ্ঞাসু।

দেখ, একটা কাজ করতে হবে, অ্যাকাউণ্টেণ্ট বলছিল, তার হিসেবে পনের ষোল হাজার টাকার কি গরমিল, তার সঙ্গে কথা বলে ও-টাকাটা তুমি তোমার পাবলিসিটি এক্সপেন্সের মধ্যে দেখিয়ে দাও।

অনুপম চক্রবর্তী হতভম্ব, বিমূঢ় একেবারে।—সে কি করে হবে...

হবে হবে, তোমার ওপরে যে ছিল সেও দুই একবার এ-রকম করেছে, তোমার ভাবনা কি, আমি তো পাস্ করব।

অনুপম চক্রবর্তী স্তব্ধ খানিক। তারপর বললেন, আমি এ কাজ পারব না।

কি ? কি বললে ? নেমকহারামী কর না, তোমাকে পারতে হবে।

নেমকহারামী করব না বলেই, আমি পারব না।

রঘুনাথ শাসমল প্রথমে ফেটে পড়লেন তাঁর ওপর। যা মুখে আসে তাই বলে শাসালেন, পরে বললেন, আচ্ছা যাও, পারো কি না আমি দেখছি।

বিকেলে আবার ঘরে ডাকলেন।—কি ঠিক করলে ?

আমি পারব না।

অল্ রাইট। ইউ মে গো !

পরদিন বিবর্ণ মুখে মীনা সাকসেনা তাঁর ঘরে হাজির। শুকনো

পাংশু মুখ। কি সর্বনাশ করছ নিজের। লক্ষ্মীটি কথা শোন, শাসমল যা চায় করে দাও।

চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন অনুপম চক্রবর্তী।—গেট্ আউট! আই সে গেট্ আউট্!

পর পর তিন দিন এক অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে দিন কেটেছে, রাত কেটেছে। শ্রীলেখা ভয় পেয়ে ডাক্তার আনিয়েছে, অনুপম চক্রবর্তী ডাক্তার দেখে বেগে আগুন। অজু আব অমু অনুনয় করে দাদাকে বলেছে, তোমার কি হয়েছে আমাদের বল।

তিনি বিড়বিড় করে জবাব দিয়েছেন, বলব, আগে দেখি কি হয়।

চার দিনের দিন লিখিত চিঠি পেলেন অনুপম চক্রবর্তী, তাঁর বিরুদ্ধে কাজে গাফিলতির অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ···মীনা সাকসেনার সঙ্গে সে অশোভন ব্যবহার করে চলেছে, তার পদাধিকারের সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছে। আপাতত সহকারী প্রচার সচিবের পদে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হল, পরে কমিটি বিচার করে প্রয়োজন-মাফিক অ্যাক্‌শন নেবে।

মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলল অনুপম চক্রবর্তীর। চিঠি হাতে করে সে মীনা সাকসেনার টেবিলে এল। টেবিল খালি। মীনা দিন কয়েকের ছুটি নিয়েছে। সবই বুঝলেন তিনি। ওই চিঠির জোরে সোজা আদালতে কেস করে বসলেন। তার আগে রাতারাতি কমিটি বিচারে বসে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করল, কারণ মীনা সাকসেনার লিখিত অভিযোগ তাদের দখলে। কাজের গাফিলতির নজির বার

করাও এমন কি দুরূহ। কমিটির বিচারে অনুপম চক্রবর্তীর পদাবনতি পাকা হল। তার ওপর ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ। সেই সঙ্গে কড়া লিখিত ওয়ার্ণিং।

আপিসে দিন কতকের জন্য হৈ-হৈ হুলস্থূলু পড়ে গেল বটে, কিন্তু ঠাণ্ডাও হয়ে এল আবার। কেসে অনুপম চক্রবর্তী হারলেন। কেসের ফল বেরুবার পাঁচ দিন বাদে কোম্পানির ইউনিয়ান এক চিঠি পেল, মীনা সাকসেনার কাছ থেকে। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সে, আর জানিয়েছে অনুপম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে—রঘুনাথ শাসমল চাকরি খাবার হুমকি দেখিয়ে তাকে দিয়ে এ-কাজ করিয়েছে।

অনুপম চক্রবর্তী জেনেছেন মীনা সাকসেনার মা মারা গেছে।

হঠাৎ সশব্দে হেসে উঠেছিলেন তিনি, মা মারা গেলে এই রকমই হয় নাকি!

না, সেই চিঠি নিয়ে আবার এক প্রস্থ হৈ-চৈ হয়েছে শুধু, তার বেশি কিছু নয়। আপিস কর্তৃপক্ষের রায়, পরের চিঠিটাই বাজে এবং প্রভাবপ্রসূত।

ওই অপমানের জবাবে অনুপম চক্রবর্তীও চাকরি ছাড়লেন।

হাসি নয়, তাঁর মুখ দিয়ে যেন জ্বলন্ত আগুন ঝরছে। চোখেও। হেসে হেসে ভাইদের বলছেন, বাবার বরাত আমার, বুঝলি? বাবার বরাত।...কিন্তু বাবার মত আমি হার মানব ভেবেছিস তোরা? অ্যাঁ? আমাকে চিনতে তোদের এখনও ঢের বাকী, বুঝলি?

শ্রীলেখাকে হঠাৎ একদিন বললেন, কি আশ্চর্য! এতদিন আমি একটা শেয়ালের অধীনে চাকরী করতাম, বুঝলে! রঘুনাথ শাসমলের মুখখানা মনে পড়তেই দেখি, একটা মস্ত শেয়াল আমার দিকে দাঁত বার করে চেয়ে আছে!...আর ওই মীনা সাকসেনা! কি কাণ্ড, কি

কাণ্ড! একেবারে পোষা বিড়াল একটা, বুঝলে! যত মার ধর, বাড়ি ছেড়ে নড়বে না, শেষে ডাণ্ডা মেরে মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দাও—তখন পালাবে। বেচারী মীনা সাকসেনা, ওর কি আর হাড়গোড় আস্ত আছে—পালিয়েছে বটে, কিন্তু এ মার কতদিন সামলাতে পারবে কে জানে।

দু'ভাই মিলে পরামর্শ করে চিকিৎসার তোড়জোড় করেছে। কিন্তু গোড়ার দিকে ডাক্তার দেখলেই ক্ষেপে উঠেছেন অনুপম চক্রবর্তী। তাঁর উত্তেজনা আর তাঁর ক্ষোভ পুরুষের পুরুষাকারের। ভাইয়েরা কি তাদের মত দুর্বল ভেবেছে দাদাকে? তাঁর হাতে কলম আছে, সেটা তো কেউ কেড়ে নেয়নি। কলম দিয়ে কি আগুন ছড়াতে পারেন, তাই এখন সকলে দেখবে চেয়ে চেয়ে। শ্রীলেখাকে বলেছেন, তুমি কিছু ভেবো না, লিখে আগের থেকে বেশি রোজগার করব আমি।

সেই তপ্ত উত্তেজনা নিয়ে লিখতে বসেছেন। পাতার পর পাতা লিখেও গেছেন। রাত জেগে লিখেছেন। কিন্তু সেই লেখা পড়ে শ্রীলেখার সর্বাঙ্গ হিম। প্রতি পাতায় সমাজের দুষ্ট ক্ষতের মত কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে রঘুনাথ শাসমল, লেখক তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর এসেছে মীনা সাকসেনাও—প্রেয়সীরূপে শত্রুরূপে শেষে মাতৃরূপে।

লেখার নাম ছিল, নামী লেখকের লেখা বাঁধা প্রকাশকরা সচরাচর পড়ে দেখে না, পাণ্ডুলিপি সোজা প্রেসে পাঠিয়ে দেয়। সেই বই ছাপা হয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম চক্রবর্তী চাহিদা প্রায় শেষ। কাগজের সমালোচনায় যে ঠাট্টা আর বিদ্রূপ বর্ষণ হল, সে-সব লেখকের অগোচর রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা শ্রীলেখার। কিন্তু প্রকাশক আর পরিচিত পাঠকদের মন্তব্য ঠেকানো যাবে কি করে।

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে অনুপম চক্রবর্তী একেবারেই বুঝতে পারেন না এমন নয়। ছাপার অক্ষবে নিজের লেখা পড়ে নিজের কাছেই ভয়ানক অস্বাভাবিক লেগেছে। ফলে শ্রীলেখার ওপর ক্রুদ্ধ।—তোমাকে জিজ্ঞেস করলেই বল বেশ হয়েছে, তুমি দেখইনি মোটে!

পরেই বইখানা মোটামুটি হয়েছে, আব প্রকাশকের দপ্তরে নিয়ে যাবার আগে শ্রীলেখা তাঁর অগোচরে অনেক কাটা ছেঁড়াও করেছে। অন্য এক অর্ধ-অনিচ্ছুক প্রকাশকেব মারফত সে বইও ছাপা হয়েছে। কিন্তু লেখকের চাহিদা আরো কমেছে বই বাড়েনি।

ততদিনে প্রকাশকরা ও ব্যাপারে খানিকটা বুঝে নিয়েছে। এরপর পাণ্ডুলিপি নিয়ে দপ্তবে হাজিব হলে তাঁরা সবিনয়ে জানিয়েছে যে, মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে, একেবারে পড়তি বাজার, নতুন বই ছাপাই বন্ধ একরকম।

নির্ভরতার নিশ্চিন্ত পথটাও সংকীর্ণ হতে হতে একরকম বন্ধই হয়ে গেল। অনুপম চক্রবর্তীর ক্ষোভ বাড়ছে, হতাশা বাড়ছে অসহিষ্ণু উত্তেজনাও বাড়ছে। আহার কমছে, ঘুম কমে আসছে। ভাই অজিতেশের ওপরেও বিরূপ এক এক সময়। সে তার চিকিৎসার ব্যাপার নিয়ে জোরজবরদস্তি করে, মন বুঝে চলে না। তাঁকে বলেন, পুলিসের চাকরিতে তোদের মত ছেলে আসা দরকার বলেছিলি, কিন্তু এসে কি করতে পারলি? বলেন, তুই মাইনে পাস কত? এত বাবুয়ানী করিস কি করে? ভাল চাস তো এখনো ওই চাকরি ছেড়ে অন্য কিছু'তে ঢুকে পড়।

যত দিন যাচ্ছে, মস্তিষ্কের ভারসাম্য কমে আসছে। দেড়টা বছর কেটে গেল এই ক'রে, কিন্তু মানুষটা যেন গোঁ ধরে তলিয়েই যাচ্ছেন। এই সময় ছোট ভাই অজু আবার বম্বেতে বদলী হয়ে

গেল। তখন প্রমাদ গুনল শ্রীলেখা। সংসার বলতে গেলে এতদিন সে-ই চালাচ্ছিল। এরই মধ্যে অজিতেশ আর একটা প্রমোশন পেয়েছে এবং তার এলাকার নির্দিষ্ট কোয়ার্টার-এ উঠে এসেছে। দু'ভাই পরামর্শ করে দাদা বউদি আব নান্নুকে তার ওখানেই নিয়ে যাওয়া স্থির করল। বউদিব অসহায় মুখ দেখে অজিতেশ বলল, দাদা আমাদের কতখানি তুমি জানো না—আমাদেব মা বলতেও দাদা, বাবা বলতেও দাদা, আজ আমাদেব যা কিছু সব দাদার জন্যে, তুমি ইতস্তত করছ কেন?

না, শ্রীলেখা ইতস্তত করেননি, এই ব্যবস্থায় সায় না দিয়ে উপায় কি? আর ওরা দু'ভাই যে যথাসাধ্য কবছে সে তো নিজের চোখেই দেখছে। ওদের এত চেষ্টা আর আগ্রহ দেখে এক একসময় তার মনে হয়েছে, ওরা যেন কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের কিছুটা সুযোগ পেয়েছে।

অনুপমবাবুকে অজিতেশের বাড়িতে তুলে আনতে বিলক্ষণ বেগ পেতে হয়েছিল। তাঁর এক কথা, বাবার মত হার স্বীকার করবেন না। সেই পরিস্থিতিতে শুক্লাই সাহায্য করেছে বেশি। তাঁর আব্দার, দিন কতক নিজের কাছে রেখে দাদার সেবা করবে। আপত্তি দেখে তার পায়ে পর্যন্ত ধবেছে সে। তাই বিজয়ীর মতই অনুপম চক্রবর্তী ভাইয়ের বাড়িতে এসেছেন। এবং তার অনেকদিন বাদে জেনেছেন আগের বাড়ি ছেড়েই দেওয়া হয়েছে।

দিন যায় মাস যায়, দুটো বছরও ঘুরে গেল। অজিতেশের কড়াকড়িতে অনুপমবাবু হাল ছেড়েই নিজেকে এই ডাক্তারের হাতে সমর্পণ করেছেন। দেওরকে ধরে আর অনেক বলে-কয়ে শ্রীলেখা চাকরি যোগাড় করেছে। শুধু টাকার জন্যেই না, টাকা অজিতেশ খরচ. করছে, অমুও মাস গেলে ভাল টাকাই পাঠায়। তবু চাকরি

একটা দরকার কেন শ্রীলেখা তাকে বুঝিয়েছে। দেওরের প্রতিপত্তি খুব এখন, তার চেষ্টায় চাকরি জুটাতে অসুবিধে হয়নি।

শোনা মাত্র প্রথমে ক্ষিপ্তই হয়ে উঠেছিলেন অনুপমবাবু। মীনা সাকসেনা সর্বস্ব দিয়ে চাকরি যোগাড় করেছিল তার মায়ের অসুখের জন্যে।...শ্রীলেখা চাকরি করতে যাচ্ছে স্বামীর অসুখেব জন্যে। কিন্তু কতটা খোয়াবার জন্যে প্রস্তুত সে? তার যেখানে চাকরি গেল শ্রীলেখা সেখানে এত অনায়াসে চাকরি পায় কোন্ জোবে।

ধৈর্য ধরে শ্রীলেখা অবিশ্রান্ত বুঝিয়েছে তাকে। কিছুই খেতে হবে না, আজকাল কত মেয়ে চাকরি কবছে। তাছাড়া নানুব খরচা পর্যন্ত দেওরেরা চালাবে এ কেমন কথা? আর নিজেদেব সামান্য হাত-খরচের জন্যেও অপরের কাছে হাত পাততে হবে এও কেমন কথা? শ্রীলেখা তাঁকে কথা দিয়েছেন, তিনি সুস্থ হয়ে রোজগার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে দেবে সে, তখন সকলে মিলে সাধলেও আর চাকরি করবে না।

অনুপমবাবু শেষ পর্যন্ত বাইরে অন্তত ঠাণ্ডা হয়েছেন। মানুষটা সব সময়েই যে অবুঝ তা নয়। কিন্তু হতাশায় আর তার বিপরীত ক্ষোভে ভিতর যখন অশান্ত তখন রাজ্যের সংশয় এসে তাঁকে ছেঁকে ধরে। যা মুখে আসে বলেও ফেলেন এক একসময়। শ্রীলেখা চুপ করে থাকে, কিন্তু অজিতেশের কানে গেলে সে কড়া মেজাজ দেখায়। দাদা বউদির ভালর জন্যেই তার এই আচরণ।

॥ সাত ॥

ছুটির দিন সেটা। সন্ধ্যার মুখে এক ফাঁকে শ্রীলেখা কিছু কেনাকাটা সারতে গেছিল। দেওর অজিতেশও বাড়ি নেই তখন। ঘরের মানুষ নিবিষ্ট মনে কি একটা বই পড়ছে দেখেই শুক্লাকে বলে শ্রীলেখা বেরিয়ে পড়েছিল।

ফিরতে একটু দেরিই হয়ে গেল। দোতলায় পা দিতেই শুক্লা তাড়াতাড়ি কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, দিদি একটা কাণ্ড হয়েছে—

শ্রীলেখা শঙ্কিত।—কি ?

তোমার আপিসের নারায়ণ এসেছিলেন এমনি, তুমি নেই, সে গেছে পার্টিতে আর দাদা তখন নীচে—দাদাই তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিল।

শ্রীলেখার বুক দুরু দুরু।—তুই সামনে ছিলি না ?

ছিলাম তো, কিন্তু দাদা তখন আমার দিকে এমন করে তাকাতে লাগলেন যে আমার ভয়ই ধরে গেল, আমি বাপু পালিয়ে বাঁচলাম।

শ্রীলেখার রাগই হয়ে গেল, কেন, দাদা কি তোকে ধরে খেত, ভদ্রলোক ওঁর অসুখের খবর জানেনেই।

চিন্তিত মুখেই এ-ঘরে এল। হাসি মুখে অনুপমবাবুও খবরটা দিলেন।—তোমাদের নারায়ণ সাহেব এসেছিলেন, বললেন এমনিই ঘুরতে ঘুরতে চলে এলেন···আসলে একটা ছুটির দিনের অদর্শনও ভাল লাগছিল না।

শ্রীলেখা গম্ভীর।—তুমি কি বললে তাকে ?

আমি ? আমি আবার কি বলব ? চায়ের কথা বলতে বললেন, থাক। অজু নেই, তুমি এক্ষুনি ফিরবে বলতেও বসল না—আমি কি হাতে পায়ে ধরে বসিয়ে রাখব তাকে! হেসে উঠলেন, আস্ত একটা হাঙর, বুঝলে—

হঠাৎ যেন কি মনে পড়ল। আচ্ছা, শুক্লা বাড়িতেও সারাক্ষণ অমন আধুনিক হয়ে থাকে কেন, আর কেউ এলে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় কেন ? তুমি বলে দিও তো, আমি এ-সব পছন্দ করি না—

অজিতেশ হাসি মুখে ঘরে ঢুকল। তার হাতে টেলিগ্রাম একটা। সুখবর দিল, অমুর টেলিগ্রাম এসেছে, সে আবার কলকাতায় বদলী হয়েছে—তরশুদিন এসে পৌঁছবে।

বুকের তলায় হঠাৎ খুশির ঢেউ উঠল যেন অনুপমবাবুর।

তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে এলেন, বলিস কি রে, কই দেখি দেখি—

হাত বাড়িয়ে টেলিগ্রামটা নিয়েই থমকালেন। ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালেন। নিমেষে খুশির ছিটেফোঁটাও নেই আব। আচমকা তড়িতাহত যেন।—তুই কি খেয়েছিস্ ?

এভাবে আক্রান্ত হয়ে অজিতেশ থতমত খেল, জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। পার্টিতে গেছিলি শুনলাম, কিসের পার্টি ? সেখানে তুই কি খেয়ে এসেছিস ?

সামলে নিয়ে গম্ভীর মুখে অজিতেশ ঘুরে পা বাড়াল। কিন্তু তার আগেই অসহিষ্ণু হ্যাচকা টানে তাকে ফেরালেন অনুপমবাবু।—হতভাগা, পাজী, বাঁদব কোথাকার, তোকে ধরে পিটব আমি, তুই মদ খেয়ে এসেছিস, অ্যাঁ ? এই উন্নতি হয়েছে তোর !

অজিতেশ ধমকেই উঠল, পাগলামি কোরো না, ছাড়ো—

ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অনুপমবাবু অশান্ত ক্ষোভে পায়চারি কবলেন বার কয়েক।—দেখলে ?

পার্টিতে গেলে এমন কি ঘরে বসেও প্রায় একটু আধটু ও জিনিস খায় শ্রীলেখা জানে। যে খাটা-খাটুনি সমস্ত দিন, শ্রীলেখা কিছু মনেও করে না।

চাপা ঝাঁঝে শ্রীলেখা জবাব দিল, দেখলাম তো, অত বড় ভাইয়ের সঙ্গে তুমি এরকম করতে গেল কেন, একটু-আধটু খেলেই খারাপ হয়ে গেল ?

অনুপমবাবু হতভম্ব একেবারে। বলে উঠলেন, খারাপ হতে কেউ চায় না, কিন্তু শেষে খারাপ হয়।···খারাপ কেউ চায় না, তবু খারাপ হয়। তুমি চাও নারায়ণ সাহেব তোমাব ওপর সদয় থাকুক, কিন্তু নিজের খারাপ চাও না, তবু গাড়িতে চড়ে পাঁচদিন তার সঙ্গে

হাওয়া খেতে বেরুলে দেখবে ভাল খারাপের ওপর তোমার হাত নেই। শুক্লা তার দিকে সকলের চোখ টানতে চায়, কিন্তু খারাপ চায় না, তবু বেশি এগোলে দেখবে খারাপের ওপর তার হাত নেই। অজু খারাপ চায় না, আনন্দ চায়—কিন্তু এই আনন্দ ওকে উঁচুতে তুলবে কি ঠেলে নীচে নামাবে বুঝতে পারছ না?

শ্রীলেখা নির্বাক। ক্লান্ত মুখে শয্যায় বসলেন অনুপমবাবু। একটু বাদে বললেন, লেখা, অমু আসছে, খুব ভাল লাগছে···নানুকেও নিয়ে এস না লেখা, বড় দেখতে ইচ্ছে করছে--

শ্রীলেখা কাছে এগিয়ে এল, বোঝাবার মত করে বলল, এই তো দেড় মাস মাত্র হল ছুটিব পর গেছে, আবার ছুটি আসুক, নিয়ে আসব।

কিন্তু ও কেন অত দূরে থাকবে···তুমি ওকে একেবারে নিয়ে এস, এখানে রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আরো কত জায়গা আছে—অজুকে বলে সেরকম কোন জায়গায় রেখে দাও।

শ্রীলেখা চুপ করে থাকে। জবাব দিলেই কথা বাড়বে, নইলে একটু বাদে নিজেই ভুলে যাবে।

পরদিন রাতে আবার এক কাণ্ড।

অজিতেশের কাজের চাপ। দেশের অশান্তি যত বাড়ছে, তার কাজের চাপ বাড়ছে। শুক্লাও সেজেগুজে একাই কি একটা অনুষ্ঠানে গেছিল। এ-রকম প্রায়ই যায়। নইলে দিনরাত তার সময় কাটে কি করে। আর এক ভদ্রলোকের গাড়িতে ফিরল ও। ভদ্রলোক তার গা ঘেঁসে এসে হাসি মুখে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল তাকে। দোতলার বারান্দার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে অনুপমবাবু দেখলেন। মুখ তক্ষুনি ভয়ানক গম্ভীর তাঁর, ভিতরে কি যেন যাতনা একটা। ব্যাপার বোঝার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীলেখার মুখে শঙ্কার ছায়া।

শুক্লা দোতলায় উঠতেই অনুপমবাবু তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।
—কোথায় গেছিলে ?

শুক্লা সভয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে নিল।—একটা সোশ্যাল গ্যাদারিং ছিল।

সেখানে তুমি একা যাবে কেন ? অজু সঙ্গে থাকবে না কেন ? আর ওই লোকটাই বা কে ?

শুক্লার মুখ লাল। অনুপমবাবু গজগজ করে ঘরে চলে যেতেই শুক্লা বলে উঠল, আচ্ছা দিদি, দাদা আজকাল আমাকে যা-তা বলেন আর বিচ্ছিরি করে তাকান দেখেও তুমি চুপ করে থাক কি করে ?

দুপ দুপ পা ফেলে সে তার ঘরে চলে গেল।

যন্ত্রণা চেপে শ্রীলেখা ঘরে ঢুকতেই অনুপমবাবু কাছে এগিয়ে এলেন।—আচ্ছা, অজু আর শুক্লার বিয়ে হয়েছে কতদিন হল ?

শ্রীলেখা চুপচাপ চেয়ে রইল একটু—বছর পাঁচেক হবে···কেন ?

পাঁচ বছর ! এর মধ্যে ওদের একটাও ছেলেপুলে হল না কেন ?

হল না তাতে তোমার কি ?

স্ত্রীর উষ্মা দেখে অনুপমবাবু অবাক।—বা রে, আমারই তো সব !···অজুটা দিনরাত তার কাজ নিয়ে আছে···শুক্লা ঘর চেয়েছিল··· ওটা বাবুই পাখি একটা···মনের মত ঘর পেল কিনা কে জানে।

রাতে নিজেই ভাইয়ের ওপর চড়াও হলেন তিনি। নীচে লোক বসিয়ে রেখে একটু জল-টল খেয়ে আবার নীচে নামছিল। বাধা পড়ল, এই গাধা শোন, পাঁচ বছর ধরে তোদের বিয়ে হয়েছে ছেলেপুলে হয় না কেন ?

শ্রীলেখা চেষ্টা করল তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে, কিন্তু পারা গেল না। দরজার ওধারে শুক্লা দাঁড়িয়ে। অজিতেশ বলল, তুমি আজকাল বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছ দাদা, এরপর সত্যি 'আমাদের

অন্য ব্যবস্থা করতে হবে—

রাগত মুখে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন অনুপমবাবু, বাড়াবাড়ি আমি করছি, তুই পুলিসের মেজাজে কাজে ডুবে আছিস, তোর বউ ওদিকে অন্য লোকের সঙ্গে সোশ্যাল গ্যাদারিং করে বেড়াচ্ছে—বাড়াবাড়ি আমি করছি ?

আঃ, দাদা ! নীচে লোক রয়েছে, শীগগির ঘরে যাও বলছি।

লোক রয়েছে তো আমার বয়েই গেল, আমি কারো পরোয়া করি !

গজরাতে গজরাতে চলে গেলেন তিনি। অজিতেশ বলল, বউদি, তোমাকে আগেও বলেছি এখনো বলছি, একটু শক্ত হও। দাদা বেড়েই চলেছে, দেখছ না···আমাকে কটু কথা বলতে শুনে তুমি হয়তো দুঃখ পাও, কিন্তু আমাদের দাদা আমাদের কতখানি সেটা আমরা ভুলিনি···তুমি শক্ত হতে পারছ না বলেই আমাকে আরো বেশি শক্ত হতে হচ্ছে।

মুখ গম্ভীর করে শুক্লা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চাউনিটা কেন যেন স্বামীর প্রতিও সদয় নয়। অস্ফুট স্বরে শ্রীলেখা অজুকে বলল, জানি ভাই, একমাত্র তোমাকেই একটু যা মানে দেখছি···তুমি না থাকলে এতদিনে আমিই পাগল হয়ে যেতাম।

সিঁড়ি দিয়ে হাত ধরাধরি করে হাসি মুখে দুজনে ওপরে উঠে আসছে।

অমু আর শুক্লা। শুক্লা স্টেশনে গেছিল তাকে আনতে। অজুর বসার ঘরে সকাল থেকে লোকজনের ভিড়।

সিঁড়ির মাথায় হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনুপমবাবুও। তাঁর পাশে শ্রীলেখা। হাত ধরাধরি করে ওদের উঠে আসতে দেখে মুখের হাসির ওপরেই চোখে যেন হঠাৎ ছোট হুল ফুটল অনুপমবাবুর। কিন্তু পরক্ষণে সেটা তিনি সামলে উঠতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই ব্যতিক্রম ততক্ষণে শ্রীলেখার চোখে পড়েছে। থতমত খেয়ে শুক্লা দেওরের হাত ছেড়ে দিয়েছে।

অমু উঠে এসে প্রণাম করতে নিঃশব্দে খানিক বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন অনুপমবাবু। তারপর জড়িয়ে ধরেই ঘরে নিয়ে এলেন। ভাইয়ের সাড়া পেয়ে অজিতেশও নীচে থেকে ওপরে উঠে এল।

তাকে আর শ্রীলেখাকে প্রণাম করে অমিয় হাসি মুখে দাদার দিকে ফিরল।—দাদা কেমন আছ বল।

অভিমানেব সুরে অনুপমবাবু জবাব দিলেন, খুব ভাল, বাড়ির হালচাল বদলাচ্ছে, অজু আজকাল ড্রিঙ্ক-ট্রিঙ্ক করছে, তোর বউদি আবার তাকে সাপোর্ট করছে, বেশ আনন্দেই দিন যাচ্ছে।…তুইও তো মস্ত চাকুরে, ওই অভ্যেস একটু-আধটু করছিস তো?

অমু ফাঁপরে পড়ল, অজু গম্ভীর মুখে নীচে নেমে গেল। শ্রীলেখা ধমকের সুরে বলে উঠল, তোমার মাথায় দিনরাত লোকের দোষ ত্রুটিই ঘুরছে।

অনুপমবাবু জবাব দিলেন, আমার মাথাটা নিয়েই যখন সন্দেহ তখন আর তোমাদের ভাবনা কি—

অমু তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ টেনে আনল।—আমি যখন এসে গেছি দাদা, তখন আর তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, দু'দশ দিনের মধ্যেই তোমাকে সারিয়ে তুলছি, দেখ—

অনুপমবাবু তাকালেন তার দিকে। কাছে এসে আবার জড়িয়ে ধরলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, অমু, আমার বড় কষ্ট রে, ওরা কেউ

বুঝতে পারে না···অমু আসার ফলে বাড়ির হাওয়া একটু হাল্‌কা দিনকতক। কিন্তু শ্রীলেখা বুঝতে পারে তার ঘরের লোকের মাথায় আবার নতুন করে জট পাকাচ্ছে কিছু।

অমু আসাতে সব থেকে বেশি খুশি শুক্লা। মনের মত সঙ্গী পেয়েছে। অমু মাত্র বছর তিনেকেব বড় ওর থেকে। অনুপমবাবু ওদের হৈ-চৈ আর ফূর্তিটা চেষ্টা করেও সহজ চোখে দেখতে পারেন না। গোড়ায় গোড়ায় তাঁর খুঁতখুতুনি শুরু হল শুক্লার ওই এক গোঁ-ধরা অতি আধুনিক সাজ-সজ্জা নিয়ে। তাঁরই চোখে লাগে, অমুটার কেমন লাগে···

অমিয়র আপিস থেকে ফেরার সময় হলেই শুক্লা প্রস্তুত হতে থাকে। কোনদিন তাকে সিনেমায় টেনে নিয়ে যায়, কোনদিন বা এমনি বেড়াতে। ফিরতে এক-একদিন রাতও হয় বেশ আর এদিকে এই মানুষকে ছটফট করতে দেখে শ্রীলেখা। তাকে ঠাণ্ডা করার জন্য শ্রীলেখা বলে, ছেলে মানুষ একটু আনন্দ করবে না, অজুর তো একেবার সময় হয় না···একদিন সেও আমার সঙ্গে কি কাণ্ড করেছে মনে নেই? ওদের বেলায় দোষ হল···

গম্ভীর মুখে অনুপমবাবু প্রশ্ন করেন, তুমি ও-রকম সাজ পোশাক করতে?

শ্রীলেখা উষ্ণ জবাব দিয়েছে, যখনকার যেমন, এ-রকম সাজ পোশাক আজকাল ঢের মেয়ে করছে, তাতে পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপমবাবু বললেন, আফ্রিকার বাবুই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে মস্ত একটা বাসা···উল্টো বাসা করে···কিন্তু ভিতরে ওদের ব্যবস্থায় কোন ভুল হয় না···শুক্লা বাবুইর উল্টো বাসায় কি হবে কে জানে···

একদিন হঠাৎ তাঁর মাথায় এল অমুর বিয়ে দেওয়া দরকার, বয়েস পেরিয়ে যাচ্ছে। স্ত্রীকে তাগিদ দিয়েও ফল হল না দেখে অজুকে কথাটা বললেন তিনি। অমুর বিয়ের জন্য দাদা এত ব্যস্ত কেন সেটা এখন সকলের কাছেই স্পষ্ট। তাঁর সংশয় এবং বিকৃত মস্তিষ্কের আচরণ অজুও জানে। গম্ভীর মুখে জবাব দিল, দেওয়া যাবে, অমুকেই মেয়ে পছন্দ করতে বল—

অনুপমবাবু তেতে উঠলেন, ও কেন পছন্দ করবে, তুই আমি কেউ না?

এ ব্যাপারে কেউ না হওয়াই ভাল তুমি আমি কার পছন্দমত বিয়ে করেছিলাম?

অমু হেসে হেসে বলে, দাদাই এবার আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াবে দেখছি—শুক্লার ঘরে ঢুকে সেদিন শ্রীলেখা দেখে ওরা দুজন কি নিয়ে হাসাহাসি করছে খুব। তাকে দেখে অপ্রস্তুত একটু

কি হল?

ছদ্ম কোপে শুক্লা বলল, দেখ দিদি, ওই পাজি আমাকে যা-তা বলছে!

আমি কি যা-তা বললাম! অমু শ্রীলেখাকেই সালিশ মানল, আচ্ছা বউদি তুমিই বিচার কর, উনি আমাকে বললেন, দাদা প্রায়ই আজকাল এমন ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকে আমার দিকে যে রিতিমত ভয় করে। আমি বললাম, দাদা চেয়ে থাকে বলেই ভয় করে, আর অন্য লোক চেয়ে থাকলে ভাল লাগে—কি এমন অন্যায় বলেছি বল তো?

কি যে তোমাদের কথা-বার্তা!

শ্রীলেখা সহজ মুখেই ঘর ছেড়ে চলে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু বুকের তলায় যন্ত্রণা। আর ঠিক তক্ষুণি অনুপমবাবু জিজ্ঞাসা

করলেন, অমুটা এখানে আসে না কেন, ওরা দুটোতে কি করছে ?

শ্রীলেখা ফেটেই পড়ল, যা খুশি করুক তোমার তাতে কি ? ফের যদি তুমি এ-রকম কর তো তোমাকে ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখে দেব বলে দিলাম ? ওদের সন্দেহ করতে তোমার লজ্জা করে না ?

স্ত্রীকে রাগতে দেখলে অনুপমবাবু হাসেন খুব। হাসতে লাগলেন, তারপর বললেন, সেই—সেই বহু দূরের দিকে চেয়ে দেখ, প্রবৃত্তির সেই আদিম মালভূমির মানুষেরা যেখানে মা-বোনকেও পৃথক চোখে দেখত না, সভ্যতার পোষাক পরিয়ে সেটাকে মেরে ফেলা যায়নি, বুঝলে—এ তো দেওর আর ভাইয়ের বউ সম্পর্ক, সুযোগ সুবিধে পেলে সেটা ঠিক তেমনি করেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পাবে, বুঝলে ?

বুঝলাম ! দিনে দিনে অনেক বুঝেছি, রাগে দুঃখে গলার স্বরও একটু চড়ল শ্রীলেখার, সেই প্রবৃত্তি তোমাব মধ্যেও আছে নাকি— তুমি শুক্লার দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখ ?

অনুপমবাবু বিমূঢ় খানিক, তারপরেই হেসে উঠলেন, ওটা তো বাবুই পাখি···বাবুই পাখি দেখি !

দিনে দিনে মাসে মাসে অবস্থা খারাপের দিকে গড়াচ্ছে আরো। এক একসময় অনুপমবাবুকে সামলে রাখাই দায়। ফলে বাধ্য হয়েই বাইরেব আচরণ আরো কঠিন করে তুলতে হচ্ছে অজিতেশকে। শুক্লা ভাসুরেব সামনে আসাই ছেড়েছে একরকম।

সকালে কাগজ হাতে পড়লেই চিৎকার করে গালাগালি করেন। খুনের খবর দেখলেই তাঁর মাথা গরম হয়ে যায়। আর প্রতিদিনের কাগজেই তো খুনের খবর। আবার চেষ্টা করেও তাঁর কাছ থেকে

কাগজ আড়াল করা যায় না। এক ছেলে অন্য ছেলেকে মেরেছে পড়লে ছেলেদের গালাগালি করেন, পুলিস মেরে থাকলে পুলিসকে।

সেদিন সকালে কাগজ পড়ে আঁতকে উঠলেন। একজন পুলিস অফিসার খুন হয়েছে। ত্রাসে ছুটে নীচে নেমে এলেন তিনি। অজিতেশ তখন অন্য লোকের সঙ্গে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে—দরকারী রাউণ্ডে বেরুবে।

তার আগেই তাকে জাপটে ধরে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন অনুপমবাবু, অজু, ভাই আমার, তুই বেরোস না, তুই কোথাও যাস না। আজকের কাগজ দেখেছিস!

হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে অজিতেশ বলল, দেখেছি, তোমার কোন ভয় নেই। না না, অজু আমি তোকে যেতে দেব না!

আঃ, দাদা! বাধ্য হয়েই গর্জন করে উঠল অজিতেশ, হাত ছাড়িয়ে হুটো লোককে ইশারা করল তাঁকে ওপরে নিয়ে যেতে।

গাড়ি চলে গেল। ওপরে এসে কাঁদো কাঁদো মুখে অনুপমবাবু বললেন. কেউ আজকাল আমার কথা শোনে না, কেউ না—

খানিক বাদে লক্ষ্য করলেন, সেজে-গুজে অমিয়র সঙ্গে শুক্লা বেরিয়ে গেল। রুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীলেখাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি, এই সকালেই এঁরা চললেন কোথায়?

শ্রীলেখা ঠাণ্ডা জবাব দিল, ক্রিকেট খেলা দেখতে।

অনুপমবাবু গুম হয়ে বসে রইলেন।

হুপুরে রেডিওয় খবর শুনলেন, খেলার মাঠের গেটে পাঁচটা লোক পিষে মারা গেছে, ক্ষিপ্ত জনতার ভিড় সামলাতে মাউণ্টেড পুলিস তাড়া করেছিল, সেই হুড়োহুড়িতে পাঁচ-পাঁচটা লোক পায়ের তলায় পড়ে পিষে মারা গেছে।

ভয়ে ত্রাসে অনুপমবাবু বাড়ির মধ্যেই ছোটাছুটি শুরু করে

দিলেন। শ্রীলেখা যত বোঝাতে চেষ্টা করেন ওরা সাধারণ টিকিটে যায়নি, তত তার ওপরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অনুপমবাবু।

শেষে পাঁচটা বাজার পর শ্রীলেখা খবর দিল, অমু টেলিফোন করেছে, খেলার শেষে ওরা কোথায় যাচ্ছে, ফিরতে দেরি হবে।

একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় অনুপমবাবু হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর একটু একটু করে নীরব ছটফটানি বাড়তে থাকল তাঁর। বাইরে গুম।

ওরা ফিরল রাত প্রায় আটটার পরে। দুজনেই পান চিবুচ্ছে। শুক্লার কথা কানে এল, দিদিকে বলছে, খেয়ে এসেছে বাড়িতে খাবে না।

অমু তার ঘরে ঢোকার আগেই অনুপমবাবু তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পাঁচ পাঁচটা লোক ওইভাবে মরে গেলে, তার পরেও খেলা হল?

বিব্রত মুখে অমিয় জবাব দিল, হল তো…

আর সেই খেলা তোরা দেখলি বসে?

অমিয় নিরুত্তর।

…সেই পাঁচটা লোক তোদের কেউ নয়, তাই তারপরেও তোরা মাঠ থেকে বেরিয়ে রেস্টুরেণ্টে খেয়ে দেয়ে ফুর্তি করে বাড়ি ফিরলি?

অমিয় প্রমাদ গুণছে মনে মনে। অনুপমবাবু হেসে উঠলেন, তারপর বলতে বলতে সামনের দিকে এগোলেন, আশ্চর্য! আমার নাকি মাথার ঠিক নেই!

শুক্লার ঘরের সামনে থমকালেন। ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।… অমুটা অমানুষ নয়, কিন্তু আজ এমন অমানুষ হতে পারল কি করে? কাকে দেখে? কাকে পাশে পেয়ে?

ঘরে ঢুকে পড়লেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুক্লা নিজেকে

দেখছিল, চমকে ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে
কাঁধে হাত রাখলেন। থমথমে মুখ, থমথমে (
টেনে আনলেন তাকে, তারপরে দেখতে লাগ

দিদি!

আর্ত চিৎকারে ওপাশের ঘর (
এদিকের দুই ঘর থেকে শ্রীলেখা আর
নেই অনুপম চক্রবর্তীর। থাবাব
নির্নিমেষে মুখখানা দেখছেন।

অজিতেশের একধা
শুক্লার সমস্ত মুখ f
ঠেলতে ঠেলতে f
দিল অজিতে
সঙের মত

অমু

॥ আট ॥

র একটা কিছু ঘটবে। চূড়ান্ত কিছু নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সেই দিন
এগিয়ে আসছে।···সেই এক রাতের পর তিন মাস ধরেই সেই দিন
ঘসছে এগিয়ে আসছে। শ্রীলেখা তার অমোঘ পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।
অনু ঘরের লোকের দিকে চেয়ে তার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছে। বাড়ির
তা অন্যদের দিকে চেয়েও।

বিস্ম ভাইয়েরা, বিশেষ করে অজিতেশ এখন আর দাদার ব্যাপারে
··· তার সঙ্গে পরামর্শ করে না। ডাক্তারের সঙ্গে করে, আর অমুর সঙ্গে
করে। বউদিকে দুর্বল জেনে নিয়েছে সে, সেই দুর্বলতার প্রশ্রয়ে

দাদার উপকার অন্তত কিছু হয়নি। তাই একটা ব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে অজিতেশ, বৌদিকে সেটা জানিয়েছে, বলেছে এ ছাড়া উপায় নেই।

আবার ওই ভাইকে দেখলে অনুপমবাবু কাছে আসতে চান না, সভয়ে দূরে সরে যেতে চান। বিড়বিড় করে বলেন, হায়না···ওর দিকে তাকালেই একটা হায়নার মুখ দেখি কেন আমি। আমার চোখ দুটো কেউ গেলে দিতে পারে না।

সেদিন সকালে আবার বেপরোয়া উগ্র মূর্তি। কাগজে পড়েছেন, অজুর এলাকার পুলিস গত পরশু একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছিল। পুলিসের জিম্মায় থাকাকালীন তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে, এই নিয়ে শহরে হৈ-চৈ হয়ে গেছে গতকাল।

ক্ষিপ্ত আক্রোশে দোতলায় পায়চারী করেছেন তিনি। অজুর খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, সে নীচে তার বসার ঘরে জনাকয়েক অফিসারের সঙ্গে জরুরী মিটিংয়ে বসেছে।

বিড়বিড় করে শাসিয়েই চলেছেন অনুপমবাবু, আর পায়চারি করছেন। দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ। মাথায় নতুন চিন্তার ধাক্কা একটা। লম্বা-লম্বা পা ফেলে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন, রিসিভার তুলে নিলেন, তারপর নম্বর ডায়েল করলেন।

হ্যালো, রিপোর্টার সঞ্জয় বোসকে চাইছি আমি।···হ্যালো কে? রিপোর্টার সঞ্জয় বোস? আমি অনুপম চক্রবর্তী, চিনতে পারছ? কাগজে একটা ছেলের হাজতে খুন হবার যে কথা বেরিয়েছে ব্যাপারট খুলে বলতে পারো?

ওদিক থেকে টিপ্পনীর সুরে জবাব এল, খুলে আর কি বলব দাদা, আপনার ভাইয়ের জুবিসডিকশনের অফিসারদেরই হাতযশ শুনছি আমি তো একটু বাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যেই বেরুচ্ছি —

…উ…ও…ও…!

রিসিভার আছড়ে ফেলে উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে নীচে নেমে এলেন তিনি।

দরজার সামনে লোকটাকে ঠেলে সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। ঘরের আলোচনায় ছেদ পড়ল। সব ক'টি মুখের ওপর দিয়ে অনুপম বাবুর ঘোরালো ধারালো দুই চোখ অজিতেশের মুখের ওপর এসে আটকাল।

এখানে কি চাই? চাপা গর্জন করে উঠল অজিতেশ।

তার ওপর দিয়ে গলা চড়ল অনুপমবাবুর। রাগে আর ঘৃণায় অস্বাভাবিক মুখ। বলে উঠলেন, এখানে কি চাই? ষড়যন্ত্রে ব্যাঘাত ঘটল, কেমন? মানুষ খুন করে তোরা লোকের মুখ চাপা দিবি? আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, আমি সব ফাঁস করে দেব, বুঝলি? আমিই বলে দেব সক্কলকে—

অজিতেশ ঘন ঘন বেল টিপতে ঘরে ততক্ষণে তিন জন লোক এসে গেছে। তার রুষ্ট ইঙ্গিতে অপনুমবাবুকে তারা টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনুপমবাবুর গলা দিয়ে আগুন ঝরেই চলেছে, তোদের কোন ষড়যন্ত্র টিঁকবে না, আমি দুনিয়াসুদ্ধ লোককে বলে দেব তোরা খুনে—খুনে—খুনী ভাইয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কোন ষড়যন্ত্র টিঁকবে না, দুনিয়ার মানুষ সব জানুক—

পরদিন।

বেলা তখন ন'টা। তিন চারজন লোক টেনে হিঁচড়ে অনুপম চক্রবর্তীকে নীচে নামাতে চেষ্টা করেছে। তিনি চিৎকার করছেন, হাত পা ছুঁড়ে বাধা দিচ্ছেন। অমিয় তাঁর কাঁধ ধরে অনুনয় করেছে দাদা দাদা…দাদা এরকম কোরো না… অদূরে শ্রীলেখা দাঁড়িয়ে। তার

ম্খে শাড়ির আঁচল গোঁজা। এই মুহূর্তে অন্তত সে কাঁদবে না
কাঁদতে চায় না। তার হাত দুয়েক তফাতে মূর্তির মত শুক্লা দাঁড়িয়ে।

না না না, আমি যাব না···কেন যাব? কেন তোরা আমাকে
নিয়ে এমন টানা-হেঁচড়া করছিস, কেন কেন?

লোকগুলো শেষে একরকম পাঁজাকোলা করেই নীচে নামাল
তাকে।

পিছনে অমিয় নেমে এল। তারপর শ্রীলেখা। পাশে পাশে
শুক্লা।

গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে পুরো য়ুনিফর্ম পরা অজি
দাদাকে সে-ই নিয়ে যাচ্ছে।

গাড়ির সামনে এসে অনুপমবাবুকে দাঁড় করাতেই দ্বিগুণ
ধস্তি। দ্বিগুণ চেঁচামেচি। যাব না, যাব না! ছেড়ে দাও আমা
ছাড় বলছি!

পাঁচ পাঁচটা লোক তাঁকে আগলে রেখে গাড়িতে তোল
চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। পেরেই উঠছে না তারা।

ছাড়! অজিতেশের হুকুমে ঘর্মাক্ত মুখে লোকগুলো
দাঁড়াল।

অজিতেশের হাতের চকচকে কালো বেটনটা শূন্যে উঠল,
পরেই অনুপম চক্রবর্তীর কাঁধ পিঠ বেড়িয়ে প্রচণ্ড আঘাত একট

মুহূর্তে স্তব্ধ সকলে। অনুপমবাবু নিজেও।

ওঠ! অজিতেশ হুকুম করল।

দু'চোখ টান করে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালেন
উদ্‌ভ্রান্ত চোখের পাতায় জলের আভাস। বিড়বিড় করে বল
মারলি তুই আমাকে···মারলি···কোথায় যাব···পাগলা
দেখতে?···দেখে কি হবে·· তোদের সকলের জায়গা হবে এ

গাড়ি এ-দেশে আছে···

বলছি ! আবার হাত উঠল অজিতেশের।

আর দরকার হল না। অনুপম চক্রবর্তী গাড়িতে উঠলেন। ত অজিতেশ। সামনে আরো দুজন কর্মচারী। ড্রাইভার সহ।

লেখার দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে। জ্বলন্ত দৃষ্টিটা তার মুখের ওপর স্থির। গাড়িটা নড়তে অজিতেশ এদিকে ফাল। কিন্তু শ্রীলেখার চোখে চোখ রাখতে পারল না, একটা তাই যেন তার দৃষ্টি সামনের দিকে ফিরল।

অস্বা লেখার জলন্ত দু'চোখ আস্তে আস্তে অমিয়র মুখের ওপর ব্যাপৃত হল। বিবর্ণ নিষ্পন্দ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে।

দি লেখার দু'চোখ এবার তাকে ছেড়ে শুক্লার দিকে ঘুরল। জ্বলন্ত দৃষ্টিটা যেমন থমকাল এবার একটু।···শুক্লার দুই গাল বেয়ে দরদর নেমেছে।

শ্রীলেখা চেয়ে রইল খানিক, তারপর ধীর পায়ে ওপরে উঠে এল।

দুপুর।

ধীর ঠাণ্ডা মুখে চিঠি লিখছে শ্রীলেখা। দরকারী চিঠি। এ চিঠি ছে দার্জিলিংয়ে নান্নুর স্কুলের ফাদারের কাছে। সামনের টার্ম শেষ রাই তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসবে, এই বক্তব্যটুকুই গুছিয়ে খতে হবে।···এখানে এনে দেখেশুনে কোন মিশনে রাখতে হবে কে, কিন্তু সে-সব পরের ভাবনা পরে। চিঠিখানা শেষ করে আবার কে বেরুতে হবে। কলকাতায় গোটা কয়েক ওয়ার্কিং গার্লস স্টেল আছে তারই কোন একটায় নিজের থাকার ব্যবস্থা পাকা রে আসবে।

কিন্তু ছোট চিঠিটা শেষ করতে গিয়ে বার বার বিমনা হয়ে

পড়েছে শ্রীলেখা।

মানুষটার মাথা বিকৃত তো বটেই···কিন্তু ওই বিকৃতমস্তিষ্ক যখন যে কথা বলে গেছে তা এই গোছের নির্ভুল হয় কি করে!

আপিসে নারায়ণ সাহেবের লুব্ধ সান্নিধ্যের আওতা নিজেকে ছিনিয়ে আগলে রাখার দায় বেড়েই চলেছে তার। এ তাকে কয়েকটা কথা বলবে স্থিরই করে ফেলেছে শ্রীলেখা। ব মিস্টার নারায়ণ, আমি নিতান্ত দুরবস্থায় পড়েই এই চাকরি ক এ চাকরি যাতে আমাকে ছাড়তে না হয়, আপনি দয়া করে দেখবেন।

··মাত্র তিন দিন আগে অমু এসে তাকে চুপি চুপি জানিয়ে এখান থেকে সে অন্যত্র চলে যাবে ঠিক করেছে। খোলাখুলি বলে মেজদা দিন রাত নিজের ব্যাপারে ডুবে আছে, মেজ বৌদির দি তার তাকানোরও ফুরসত নেই···মাঝখান থেকে ও-ই কি-রক জটিলতার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, তাই এখান থেকে সরে পড়াই ভা ভাবছে।

···আর সেই এক রাতে বিস্মৃতির নিবিড় তৃষ্ণার মুখে লোকটাকে ঠেলে দিয়ে নিজে যে ছিটকে সরে গিয়েছিল, তার কারণটাও ধরা পড়েছিল ওই বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষের চোখেই।···আশ্চর্য!

আরো আশ্চর্য, আজ শ্রীলেখা অনুভব করেছে, ওই বিকৃত মানুষ যা বলত, সে-সবের একটা স্পষ্ট ছায়া পড়ছিল তার মনের ওপরে আজকের এই পরিণামের সব কিছুর জন্যেই যেন ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হয়েছিল শ্রীলেখা, অপেক্ষা করছিল।

, একেবারে সবকিছুর জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

বখরে চোখ দুটো নরম হয়ে আসতে লাগল শ্রীলেখা চক্রবর্তীর।··ওই গুরুর চোখেই এত জল দেখবে ভাবতেও পারেনি